দাম : দশ টাকা

ভারতের সুরক্ষায় সামরিক বাহিনীর অবদান
— পৃঃ ১৫

স্বস্তিকা

স্বাধীনতার ৭০ বছর পরে উন্নয়নের রথ চলেছে উত্তর-পূর্ব ভারতে
— পৃঃ ২০

৭০ বর্ষ, ১ সংখ্যা।। ১৪ আগস্ট ২০১৭।। ২৮ শ্রাবণ - ১৪২৪।। যুগাব্দ ৫১১৯।। ১৫ আগষ্ট সংখ্যা।। website : www.eswastika.com ।।

স্বাধীনতার
সত্তর বছর পূর্তি

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

।। পনেরোই আগস্ট বিশেষ সংখ্যা।।

৭০ বর্ষ ১ সংখ্যা, ২৮ শ্রাবণ, ১৪২৪ বঙ্গাব্দ

১৪ আগস্ট - ২০১৭, যুগাব্দ - ৫১১৯,

Website : www.eswastika.com

সম্পাদক : বিজয় আঢ্য

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১০ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৪০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2016-18

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক রণেন্দ্রলাল ব্যানার্জী কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ▯ ৫

খোলা চিঠি : জেলের মালপো, খাবে ভাইপো
▯ সুন্দর মৌলিক ▯ ৬

সীতারামকে কেন্দ্র করে কেরল এবং বাংলা সিপিএম দু'ভাগ হচ্ছে ▯ গূঢ়পুরুষ ▯ ৭

স্বাধীনতার সাত দশক : দেশের অর্থনীতি কোন পথে
▯ অম্লানকুসুম ঘোষ ▯ ৮

সত্তর বছরে কাশ্মীর সমস্যা : নতুন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে দেখতে হবে
▯ দিব্যজ্যোতি চৌধুরী ▯ ১০

ঘরে-বাইরে চাপের মুখে সন্ত্রস্ত সন্ত্রাসবাদীরা
▯ সাধন কুমার পাল ▯ ১১

পশ্চিমবঙ্গের সীমান্ত এলাকায় জেহাদি আক্রমণের খণ্ডচিত্র
▯ বিমল প্রামাণিক ▯ ১৩

ভারতের সুরক্ষায় সামরিক বাহিনীর অবদান
▯ মেঃ জেঃ কে কে গঙ্গোপাধ্যায় (অঃ প্রাঃ) ▯ ১৫

রামজন্মভূমি আন্দোলন : অস্মিতা রক্ষার সংগ্রাম
▯ ডাঃ শচীন্দ্রনাথ সিংহ ▯ ১৭

স্বাধীনতার সাত দশক : এক দেশ, এক আইনের পথে ভারত
▯ অর্ণব ব্যানার্জী ▯ ১৯

স্বাধীনতার সত্তর বছর পরে উন্নয়নের রথ চলছে উত্তর-পূর্ব ভারতে ▯ ধর্মানন্দ দেব ▯ ২০

ভারতীয় বিদেশনীতির সাত দশক : নেহরু থেকে মোদী
▯ প্রণয় রায় ▯ ২২

চীনা ড্রাগন ঘিরে ধরেছে? উপায়ও আছে
▯ ড. অচিন্ত্য বিশ্বাস ▯ ২৪

স্বাধীন ভারতে বিজ্ঞান সাধনা ▯ ড. জিষ্ণু বসু ▯ ২৭

ক্রীড়া-বিশ্বে উজ্জ্বল আনন্দ ও আডবানী
▯ জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায় ▯ ২৯

স্বাধীন ভারতের অভিশাপ : নেহরু পরিবারতন্ত্র
▯ অভিমন্যু গুহ ▯ ৩১

চারজন রাষ্ট্রনায়কের মৃত্যু স্বাধীন ভারতেও রহস্যাবৃত
▯ সন্দীপ চক্রবর্তী ▯ ৩৩

অনুপ্রবেশকারী বিতাড়ন ছাড়া আমাদের স্বাধীনতা রক্ষা সম্ভব নয় ▯ মোহিত রায় ▯ ৩৯

অপারেশন বিহার : বিজেপি বিরোধীরা চরম অস্তিত্ব সঙ্কটে
▯ স্বপন দাশগুপ্ত ▯ ৩৭

স্বস্তিকা

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

দেশভক্তি : ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে

আগস্ট মাস আমাদের জাতীয় জীবনে এক আনন্দ-বেদনার মাস। স্বাধীনতা লাভে যেমন আনন্দ, দেশভাগ তেমন বেদনার। একদিকে দেশভক্তিকে উদ্দীপিত করার অন্যদিকে দেশভাগের ব্যথা উপশমের সন্ধানের মাস। এরই প্রেক্ষাপটে আগামী সংখ্যার আলোচ্য— দেশভক্তি : ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে।

এছাড়াও থাকছে ভারত এবং ইজরায়েলের ভাবগত ঐক্য নিয়ে একটি আলোচনা।

লিখছেন— বিশিষ্ট সাংবাদিক মানস ঘোষ, রন্তিদেব সেনগুপ্ত ও ড. নির্মলেন্দু বিকাশ রক্ষিত।

হকার বন্ধুদের
কাছে অনুরোধ
স্বস্তিকার জন্য
নীচের ঠিকানায়
যোগাযোগ করুন—

বিশাল বুক সেন্টার

৪, টটি লেন
কলকাতা-৭০০০১৬

ফোন ঃ
(০৩৩) ৪০৬৪৪১০৩
৪০৬৪৪০৯৭

সানরাইজ®

শাহী গরম মশলা

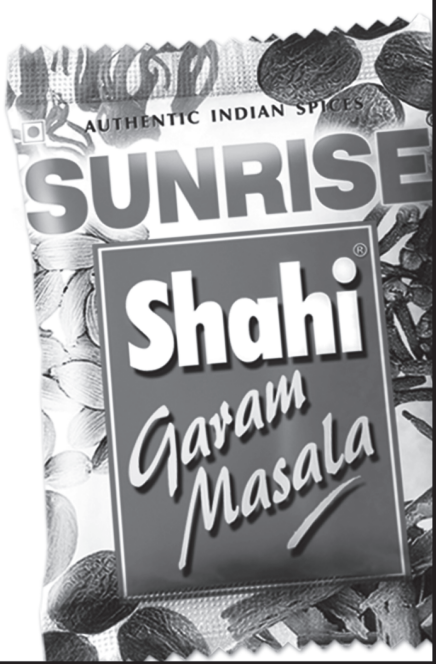

SUNRISE PURE

রান্নায় আলাদা মাত্রা এনে দেয়

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

আশার কিরণ

১৯৪৭ সনের ১৫ আগস্ট। মধ্যরাতে সেদিন ইউনিয়ন জ্যাক অস্তমিত হইল স্বাধীনদেশের ত্রিরঙ্গা নিশান উড়িল। দেশভাগের বেদনা বুকে লইয়াও ভারতবাসী আশা করিয়াছিলেন খণ্ডিত ভারতবর্ষ অতীতের ন্যায় গৌরবশালিনী হইবে, ভারতবাসী সম্পদশালী হইবেন, তাঁহাদের সন্তান দুধে-ভাতের সুখ হইতে বঞ্চিত হইবে না। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে বিপরীত হইল। স্বাধীনতা-পরবর্তী সাত দশকে দেশ দেখিল দুর্নীতির পরাকাষ্ঠা, দেশবাসী সাক্ষী রহিলেন শাসকের স্বৈরাচারের। দেশবাসী ইহাও দেখিলেন জেহাদি আক্রমণে রক্তস্নাত ভারতবর্ষ, আর কমিউনিজম নামক একশ্রেণীর বিজাতীয় ভাবধারায় আকণ্ঠ নিমজ্জিত বুদ্ধিজীবী তকমাধারী একদল মানুষের তাহাকে সমর্থনের ব্যভিচারিতাও।

আশাহত দেশবাসীর বিশেষ করিয়া তরুণ প্রজন্মের মনে দেশ-চেতনা ব্যাহত করিবার প্রয়াস, আন্তর্জাতিকতার খোয়াব দেখাইয়া আধুনিক করিবার তাগিদে তাহাদের দেশপ্রেম-বঞ্চিত করিয়া রাখিতে কমিউনিস্ট প্রগতিবাদীদের নক্কারজনক ভূমিকাও আমরা দেখিয়াছি। কিন্তু এই নৈরাশ্যের অমানিশার মধ্যে আলোকদীপ্তিটুকু দেখিবার সুযোগ এইবার আমরা লাভ করিলাম। দেশবাসী স্বাধীনতা-পরবর্তীকালে প্রথমবারের জন্য রাষ্ট্রপতি, উপরাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, লোকসভার অধ্যক্ষ প্রভৃতি সর্বোচ্চ সাংবিধানিক পদে জাতীয়তাবোধের ভাবধারায় বিশ্বাসী দেশনেতা লাভ করিয়াছেন। ইহা বড়ো কম কথা নহে। দেশভক্তিকে ভুলাইয়া দিবার, ভারতবর্ষের অতীত ঐতিহ্যকে অস্বীকার করিবার ও দেশবাসীকে বিপথগামী করিবার যে ষড়যন্ত্র করা হইয়াছে, তাহা সমূলে বিনষ্ট করিবার ইহা প্রাথমিক পদক্ষেপ মাত্র।

একবিংশ শতকে দাঁড়াইয়া ভারতবর্ষের মানুষের দেশাত্মবোধ পরিণতির দিকে অগ্রসর হইতেছে। দেশের অধিকাংশ প্রকল্পগুলি কেবল একটি পরিবারের নামে সংরক্ষিত রাখিবার যে কু-প্রয়াস, স্বাধীনতা-সংগ্রামে যাহাদের কোনও অবদানই নাই তাহাদের দেশপ্রেমের মোড়কে হাজির করাইবার চক্রান্তও সাত দশকের জড়তা কাটাইয়া ধ্বংস করিবার প্রয়াস লওয়া হইয়াছে। যে দলীয় 'ইতিহাসবিদে'রা আচার্য যদুনাথ সরকার, রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতো প্রখ্যাত প্রকৃত ইতিহাসবিদদের অবদান ও গবেষণা অস্বীকার করিবার তাল করিয়াছিল, যাহাদের স্লোগান ছিল 'ইয়ে আজাদি ঝুটা হ্যায়', যাহারা স্বদেশি আন্দোলনের বিরোধিতায় ও দেশবরেণ্যদের অপমানে নজির গড়িয়াছেন তাহারা কোন মন্ত্রবলে ভারতবর্ষের ইতিহাস রচনার অধিকার পাইয়াছিলেন তাহা আজ দেশবাসীর জিজ্ঞাস্য।

সাত সাগরের পারে বসিয়া এক অর্থনীতিবিদ ভারত-সরকারকে অপমান করিবার তাল ঠুকিতেছেন, এই সুযোগে তাঁহার চামচাবৃন্দ খোদ ভারতবর্ষকেই অপমান করিয়া মজা পাইতেছেন এই দৃশ্য দেখিবার অবকাশ কমিয়া আসিতেছে। কারণ ভারতবর্ষ আজ এক মাহেন্দ্রক্ষণে উপস্থিত। দেশবাসীর জাগ্রত চেতনায় দেশের সিংহাসনে এক দেশভক্ত সরকার। দেশ-বিরোধিতার শৃগাল-রব উপেক্ষা করিবার ক্ষমতা তাহাদের রহিয়াছে। ২০২২ সালে আসিবে স্বাধীনতার পঁচাত্তর বৎসর পূর্তি। অতীত গৌরব ফিরাইতে, জাতিকে শক্তিশালী ও সমৃদ্ধ করিতে এই পাঁচটি বৎসর তাই অতীব গুরুত্বপূর্ণ। দেশভক্তদের রক্তস্নাত কেরলকে মুক্ত করিতে হইবে, জেহাদিদের কবল হইতে পশ্চিমবঙ্গ-কাশ্মীরকে মুক্ত করিতে হইবে, দেশ-অগৌরবের যাবতীয় চিহ্ন অপসারিত করিতে হইবে, সর্বোপরি দেশ-ভক্তির অনির্বাণ দীপশিখাটি আরও উজ্জ্বল করিতে হইবে। আগামী পাঁচটি বছর দেশমাতৃকাই হউন আমাদের আরাধ্যা। মা-ঠাকুর-স্বামীজী-নিবেদিতা আশীর্বাদ করিবেন।

সুভাষিতম্

পিতৃপুণ্যভুবং রাষ্ট্রং যন্মন্যন্তে চ যে নরাঃ।
তেষাং নরাণাং রাষ্ট্রং তৎ স্বীয়ং ভবতি সর্বথা।। (রাষ্ট্রলোকা)

যাঁরা সর্বপ্রকারে রাষ্ট্রকে পিতৃভূমি ও পুণ্যভূমি বলে মনে করেন, তাঁহার কাছে রাষ্ট্র সর্বদাই আপন হয়ে থাকে।

জেলের মালপো, খাবে ভাইপো

প্রিয় পাঠক-পাঠিকা,

সময়টা ভাল যাচ্ছে না। নরেন্দ্র মোদী নামক লোকটি বড্ড একগুঁয়ে। দুর্নীতি দমন করতে গিয়ে এমন সব কাণ্ড করছে যে মুখ না খুলে পারলাম না। মোদী ভদ্রলোক এটা বোঝেন না যে, এই দেশটা পরিবারতন্ত্রের দেশ। এখানে কিছু পরিবারকে একটু আধটু ছাড় দিতে হয়। গান্ধী বাড়ির জামাই একটু সুযোগসুবিধা পাবে না কেন! এটাই তো হয়ে এসেছে। রবার্ট বঢরা ভদ্রলোক শ্বশুরকে দেখেননি। কিন্তু শ্বশুর পরিবারটা দেখেই তো বিয়ে করেছেন নাকি! এর পরে দেশের প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী চিদাম্বরম সাহেবের ছেলের এমন অবস্থা করেছেন যে তিনি আর দেশের বাইরেই যেতে পারবেন না। উত্তরপ্রদেশের সব থেকে বড় পরিবারটায় এখন রোজ বাপ-ব্যাটায় গোলমাল চলছে। লালুপ্রসাদের ছেলে, মেয়ে, জামাই সবাই সিবিআই অফিস যেতে যেতে ক্লান্ত। ক্ষমতা তো গেছেই।

এবার দিদির আদরের ভাইপোটাও বুঝি সেই তালিকায় পড়তে চলছে। এমনিতেই দিদির ভাই বোনেরা ভালো নেই। এবার ভাইপোকে নিয়ে টানাটানি হলে দিদি মুখ দেখাবেন কী করে! দিদির যে সময়টা বড্ডই খারাপের দিকে যাচ্ছে।

কেন খারাপ চলছে সেটা বুঝতে গেলে কদিন আগে বিজেপির দুই নেতা প্রকাশ জাভড়েকর আর সম্বিত পাত্রর সাংবাদিক সম্মেলনের অংশবিশেষ মনে রাখা দরকার। পড়ুন ওঁরা কী কী বলেছেন—

* ২০০৯ সালে বৈদিক রিয়ালিটির মালিক রাজকিশোর মোদীর বিরুদ্ধে জমি জবরদখলের অভিযোগে আন্দোলন করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। গ্রেপ্তারের দাবি তোলেন তৃণমূলনেত্রী। ২০১১ সালে ক্ষমতায় আসার পরে যে প্রকল্পের জন্য মোদীর গ্রেপ্তার চেয়েছিলেন সেই প্রকল্প মেনে নেয় মমতা সরকার।

* লিপস অ্যান্ড বাউন্ডস নামে একটি কোম্পানি খোলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাইপো অভিষেক। ২০১২ থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত ওই সংস্থার ডিরেক্টর ছিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর ঠিকানা রয়েছে— ৩০বি, হরিশ চ্যাটার্জি স্ট্রিট। এটিই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঠিকানা।

* ২০১৪ সালে ডায়মন্ডহারবার আসন থেকে সাংসদ হন অভিষেক। এর পরে তিনি লিপস অ্যান্ড বাউন্ডস কোম্পানির ডিরেক্টর পদ ছেড়ে দেন। সেই জায়গায় মুখ্যমন্ত্রীর পরিবারের তিন সদস্য ডিরেক্টর হন।

* রাজ্যে তৃণমূল ক্ষমতায় আসার পরে মুখ্যমন্ত্রীর ভাইপো অভিষেকের সংস্থাকে রাজকিশোর মোদীর সংস্থা দেড় কোটি টাকা দেয়। এটা মোদীর সংস্থার ব্যালান্স শিটে রয়েছে, অভিষেকের কোম্পানির ২৬ নম্বর ফর্মেও রয়েছে সেই টাকার উল্লেখ। যাঁকে গ্রেপ্তারের দাবি তুলেছিলেন মমতা, সেই অভিযুক্তই ভাইপোকে টাকা দিয়েছেন।

* রাজকিশোর মোদীর সংস্থা গ্রিন টেক সিটি প্রাইভেট লিমিটেড-এর অন্যতম ডিরেক্টর অশোক তুলসীয়ান আবার অভিষেকের সংস্থার অডিটর। এটা সোনিয়া গান্ধীর জামাই রবার্ট বঢরা, লালুপ্রসাদের ছেলে তেজস্বী যাদবের মতোই দুর্নীতি।

* সারদা, নারদ, ত্রিফলা, নিয়োগ, রোজভ্যালি বাংলায় অনেক কেলেঙ্কারি হয়েছে তৃণমূল কংগ্রেসের আমলে। এবার আরও এক দুর্নীতি সামনে এল। জবাব দিতেই হবে মমতাকে। ভাইপো পয়সা পেতেই কেন রাজকিশোরের বিতর্কিত প্রকল্প মেন নিলেন সেই জবাব মমতাকে দিতেই হবে।

* মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, তৃণমূল কংগ্রেস, 'মা-মাটি-মানুষ'- এর দল। আসলে ওটা হবে— 'আমি, আমার, আমার পরিবার'।

* তৃণমূল কংগ্রেসের আসল নাম—টোট্যাল মমতা কোরাপশন।

এখানে একটা প্রশ্ন রয়েছে। দেশের আইন অনুসারে কোনও সংস্থা কারও থেকে টাকা নিয়ে আয়কর দিলে তাতে কিছু বলার থাকে না। সেটা করেছে অভিষেকের সংস্থা। কিন্তু প্রশ্ন অন্য জায়গায়। ঠিক সেই সময় অভিষেকের পিসির সরকার ওই সংস্থাকে কী কী সুবিধা দিয়েছে। তদন্তের বিষয় হবে সেটাই। তাই ভাইপো জেলের মালপো খাবে কিনা জানা নেই, পিসির জন্য কিন্তু এখন থেকেই চিন্তা শুরু হয়ে গেল।

হাত, পা, নাক, কান যাই টানা
হোক না কেন মাথাই আসে।

—সুন্দর মৌলিক

সীতারামকে কেন্দ্র করে কেরল এবং বাংলা সিপিএম দু'ভাগ হচ্ছে

গূঢ় পুরুষের কলম

দৃশ্যটি বেশ কৌতুকজনক। সিপিএম পার্টির রাজ্য সম্পাদক সূর্যকান্ত মিশ্র প্রবল আবেগ নিয়ে দলের কর্মী-সমর্থকদের বোঝানোর চেষ্টা করছেন সাচ্চা বামপন্থীরা সর্বদাই মধ্যপন্থীদের সঙ্গে জোট করে ভোটের লড়াইটা লড়েছে। তখন একমুখ বিরক্তি নিয়ে মঞ্চ ছেড়ে নীরবে চলে গেলেন আমাদের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য মশাই। তিনি যে সূর্যকান্তের মাতব্বরিটা পছন্দ করছেন না সে কথা বুঝতে দলীয় কর্মীদের অসুবিধা হয়নি। ঘটনাটি ঘটেছে শনিবার ৫ আগস্ট কলকাতায় মহাজাতি সদনের দলীয় অনুষ্ঠানে। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি বা বামপন্থীরা চিরকালই মনে করেছে দলের স্বার্থ দেশের স্বার্থের থেকে বড়। যেভাবেই হোক রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করাটাই কমিউনিস্টদের ধর্ম। হাতে ক্ষমতা এবং পকেটে যথেষ্ট টাকা না থাকলে কমিউনিস্ট নেতারা হতাশায় ভোগেন। অথচ সমর্থকদের কাছে তাঁরা সর্বহারাদের কল্যাণে নিবেদিত প্রাণ। সততার প্রতিমূর্তি। একই নীতি তৃণমূল নেতাদের। শুধু সিপিএম নেতাদের ভণ্ডামিটা নেই তাঁদের। প্রতিদিন সকালে অসাধু ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে মোটা টাকা নজরানা না পেলে তৃণমূল নেতাদের মেজাজ খারাপ হয়। দিনটা ভাল যায় না। সে কথা তাঁরা গোপন করেন না। নেত্রীর নির্দেশে এখন তাঁদের মুখ বন্ধ রাখতে হচ্ছে। তা না হলে তাঁরা বুক ঠুকে বলতেন নারদ-চিটফান্ডের টাকা খেয়েছি, বেশ করেছি। আমরা জনপ্রতিনিধি। মা-মাটি-মানুষের জন্য কাজ করছি। শুধু গ্যাস দিয়ে ভোটে জেতা যায় না। ক্যাশ দরকার হয়। ফ্রি জনসেবা হয় না। এখানেই সিপিএম-তৃণমূলের রাজনীতির মিল। দুটো দলই ক্ষমতার সুবাদে জনসেবার নামে ক্যাশ কামাই করতে রাজনীতি করতে এসেছে। আমজনতার জন্য দেদার গ্যাস, আর নিজেদের জন্য ঝোলা ভর্তি ক্যাশ এটাই এই দুই দলের রাজনীতি।

ক্যাশ কামাই নিয়ে তৃণমূল দলের অন্দরে কোনো ঝামেলা নেই। নিজ নিজ এলাকায় কামাই নিয়ে চুনোপুঁটি নেতারা অনেক সময় খুনোখুনি করে। কিন্তু রাঘব বোয়ালরা সেইসব খুচরো ঝামেলায় নিজেদের জড়ান না। কিন্তু সিপিএম দলের নেতারা নিজেদের জড়ান। সীতারাম ইয়েচুরিকে তৃতীয়বার রাজ্যসভায় পাঠানো নিয়ে কেরল সিপিএম এবং বঙ্গ সিপিএম আড়াআড়িভাবে ভাগ হয়ে গেছে। এটা নাকি আদর্শের লড়াই। মোটেই নয়। লড়াইটা আসলে ক্যাশের। সীতারাম রাজ্যসভায় গেলে বঙ্গজ নেতারা লাভের গুড়টা খাবেন। কেরলের সিপিএম নেতারা ছিটেফোঁটাও পাবেন না। এই ঝগড়ায় কেরল এবং বঙ্গ সিপিএম নেতারা আম আর ছালা দুটোই হারালেন। মাঝখান থেকে নেপোয় দই মারার মতো কংগ্রেসের প্রার্থী মধুটি চেটেপুটে খেয়ে রাজ্যসভা আলো করতে চলে গেলেন। আর কমিউনিস্টরা ঠিকই করতে পারলেন না যে কংগ্রেস বড় শত্রু না বিজেপি।

বিপদে পড়েছেন আমাদের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি সর্বভারতীয় মহাজোট গঠন করে কেন্দ্রে বিজেপিকে ক্ষমতাচ্যুত করার কথা ঘোষণা করে দিয়েছেন। কিন্তু মমতার সেই মহাজোটে কারা থাকবে। সিপিএম (কেরল-ত্রিপুরা) কংগ্রেসের এবং তৃণমূলের জোটে যাবে না। শুধু বাংলার পার্টি যেতে চায়। এই বঙ্গজ সিপিএম নেতারা গত বিধানসভার নির্বাচনে পার্টির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের নির্দেশকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে কংগ্রেসের সঙ্গে জোট করেছিল। এই জোট পরাজিত হলেও মৃতপ্রায় রাজ্য কংগ্রেস সিপিএমের থেকে বেশি আসন পেয়ে প্রধান বিরোধী দলের স্বীকৃতি পায়। পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি যখন কৈফিয়ত তলব করে তখন রাজ্য কমিটি বিশ্বাসযোগ্য রিপোর্ট দিতে পারেনি। রাজ্য পার্টির সাধারণ সম্পাদক সূর্যকান্ত মিশ্র নিজেই বিপুল ভোটে পরাজিত হয়ে বলেছিলেন কংগ্রেস সমর্থকরা সিপিএম প্রার্থীদের কোথাও ভোট দেননি। সেটাই স্বাভাবিক। তারপরেও সূর্যকান্ত কংগ্রেসের সঙ্গে জোট করে চলার পক্ষে সওয়াল করে চলেছেন। স্বাধীনতার পরে প্রথম নির্বাচন থেকে আজ পর্যন্ত সমস্ত নির্বাচনেই সিপিএম এবং কংগ্রেস সমর্থকরা একে অপরের বিরোধিতা করেছে। এখন বদলে গেল মতটা, পাল্টে গেল পথটা বললে চলবে কেন?

১৯৬৪ সালে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি দু'টুকরো হয় চীনকে কেন্দ্র করে। চীন ভারত আক্রমণ করেছিল অথবা ভারত প্রথমে চীন আক্রমণ করে এই বিতর্কের মীমাংসা করতে পার্টির নেতারা ব্যর্থ হন। সেই সময় দেশের কমিউনিস্ট পার্টিকে ফান্ডস্ জোগাত রাশিয়া। রুশ অর্থ নেহরুর সম্মতিতে চেটেপুটে খেতেন পার্টির হেভিওয়েট সিপিআই নেতারা। বঙ্গজ কমিউনিস্ট নেতারা মধুর ছিটেফোঁটা পেতেন না। বঙ্গজ নেতারা তখন চীনের সঙ্গে যেতে চাইছিলেন। চীন-ভারত যুদ্ধের পর আক্রমণকারী কে এই প্রশ্ন নিয়ে দলের মধ্যে বিতর্ক বঙ্গ ব্রিগেডকে সুযোগ করে দেয় নিজেদের মূল দল থেকে বিচ্ছিন্ন করার। জন্ম নেয় মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি বা সিপিএম। সিপিএম নেতারা আশা করেছিলেন চীন দরাজ হাতে অর্থ দেবে। বাস্তবে তা হয়নি। কারণ, তখন চীনে সাংস্কৃতিক বিপ্লব চলছে। সেই বিপ্লবকে পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে চারু মজুমদার-কানু সান্যাল জোট সিপিএমকে শোধনবাদী বুর্জোয়া দল বলে প্রচার শুরু করে দেন। চৈনিক নেতারা চারু-কানুকেই মান্যতা দেয়। প্রমোদ দাশগুপ্ত-জ্যোতি বসু কোং-কে নয়। প্রায় ৫৩ বছর পরে দলীয় আদর্শের নামে বখরার শরিকি লড়াইতে সিপিএম দু'ভাগ হতে চলেছে। বিজেপি তাড়াতে মমতার সাধের মহাজোটের আশায় ছাই ঢেলে।

■

১৫ই আগস্ট
বিশেষ সংখ্যা

স্বাধীনতার সাত দশক

দেশের অর্থনীতি কোন্ পথে

অম্লানকুসুম ঘোষ

দেখতে দেখতে স্বাধীনতার সত্তর বছর অতিক্রান্ত হলো। আজ এই পুণ্যলগ্নে দাঁড়িয়ে খুব ইচ্ছে করে একটু ফিরে তাকাতে স্বাধীনতার সত্তর বছরে অর্থনীতি-ক্ষেত্রে দেশ কতদূর এগোলো।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসানের পর ধ্বস্ত ব্রিটিশ ও অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী শক্তির হাত থেকে স্বাধীনতা লাভ করেছিল এতাবৎকাল পরাধীন অবস্থায় থাকা এশিয়া ও আফ্রিকার দেশসমূহ। তৎকালীন বিশ্ব-অর্থনীতির দুটি ধারা আমেরিকা-নির্ভর ধনতান্ত্রিক অর্থনীতি ও সোভিয়েত-নির্ভর সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির মধ্যে কোনও একটিকে বেছে নিয়েছিল সেই সব দেশগুলি, কিন্তু ভারত ছিল সে ব্যাপারে ব্যতিক্রম। স্বাধীনতার পর ভারতীয় অর্থনীতি চালিত হয়েছিল মিশ্র অর্থনীতি নামক নেহরু-কল্পিত এক হাসজারু অর্থনীতির দ্বারা। সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির মতো রাষ্ট্র-নিয়ন্ত্রিত হলেও ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির মতো ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার ও ব্যক্তিগত বিনিয়োগের অধিকার ছিল তাতে। সোভিয়েত ইউনিয়নের অন্ধ ভক্ত নেহরু ভারতীয় অর্থনীতিকে সমাজতান্ত্রিক পথেই পরিচালিত করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু কংগ্রেস অর্থনৈতিকভাবে ভারতীয় ব্যবসায়ীদের ওপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল হওয়ায় ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার ও ব্যক্তিগত বিনিয়োগের অধিকার বন্ধ করতে সক্ষম হননি নেহরু। এই মিশ্র অর্থনীতিতে সোভিয়েত ধাঁচে বড় বড় রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হলো। পাশাপাশি ব্যক্তিগত বিনিয়োগে স্থাপিত প্রতিষ্ঠানসমূহও রইল, কিন্তু সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির নিয়মানুসারে তাদের মধ্যে ছিল না কোনও পারস্পরিক প্রতিযোগিতা। বিনিয়োগের এবং বিপণনের ক্ষেত্র পৃথক করা ছিল রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের দ্বারা।

এই হাসজারু অর্থনীতির ফল হলো মারাত্মক। ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে পারস্পরিক প্রতিযোগিতা না থাকার কারণে অন্যান্য ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রের মতো শিল্প ও পরিষেবাক্ষেত্রের গুণগত মানের উৎকর্ষ সাধন ঘটলো না, উদ্ভাবনী শক্তির বিকাশও ঘটলো না। বিনিয়োগের ক্ষেত্র রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের অধীন থাকায় নতুন বিনিয়োগকারীরা উঠে আসতে পারলেন না। আবার বিপণনের ক্ষেত্র রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের অধীন থাকায় আমলাতান্ত্রিক দুর্নীতির প্রকোপও বৃদ্ধি পেল সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির দ্বারা চালিত অন্যান্য দেশগুলির মতোই। সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির দ্বারা চালিত অন্যান্য দেশগুলিতে বিপুল রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগের মাধ্যমে যেমন উন্নত পরিকাঠামো ও শক্তিশালী ভারী শিল্পক্ষেত্র সৃষ্টি হয়েছিল, ভারতে তাও হল না। কারণ ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার, ব্যক্তিগত বিনিয়োগের অধিকার ও ব্যক্তিগত লভ্যাংশ কুক্ষিগত করার অধিকার বজায় থাকায় রাষ্ট্রের হাতে বিনিয়োগ করার মতো প্রয়োজনীয় অর্থ ছিল না। সেই অর্থ কুক্ষিগত হয়েছিল কতিপয় ব্যবসায়ীর হাতে অর্থাৎ ধনতান্ত্রিক

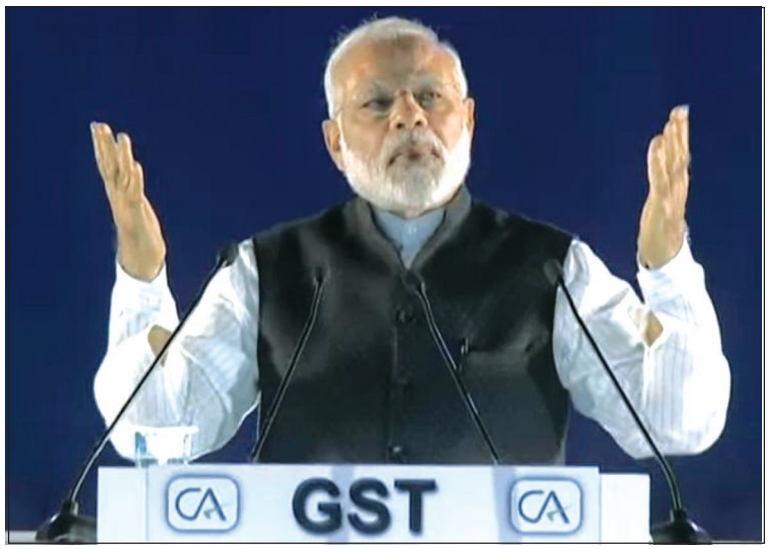

দেশগুলির মতোই আর্থিক বৈষম্য দেখা গেল ভারতে। সমাজতান্ত্রিক ও ধনতান্ত্রিক উভয় অর্থনীতির যা ক্ষতিকর দিক তা দেখা গেল এই মিশ্র-অর্থনীতির মধ্যে। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক ও ধনতান্ত্রিক উভয় অর্থনীতির যে সামান্য ভালো দিক আছে তার থেকেও বঞ্চিত হলো ভারতীয় অর্থনীতি। ধনতান্ত্রিক অর্থনীতিতে অবাধ প্রতিযোগিতা 'Survival of the Fittest' বা ' যোগ্যতমের উদ্বর্তন' ঘটায় 'মিশ্র অর্থনীতিতে 'Survival of the Richest' বা ধনীতমের উদ্বর্তন ঘটল। সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতে বিপুল রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ 'Big Push' নীতিতে পরিণত হয়ে শুধুমাত্র দুর্নীতি-মহীরুহের গোড়ায় সার জল দিল।

এভাবেই কাটলো প্রথম দু'দশক। ইতিমধ্যে হাকিম বদলালো। দু' এক হাত ঘুরে প্রধানমন্ত্রী হলেন নেহরুতনয়া ইন্দিরা। হাকিম বদলানোর সঙ্গে সঙ্গে হুকুমও কিছুটা বদলালো। এবার শুরু হলো ব্যক্তিগত বিনিয়োগে চলা সংস্থাগুলির রাষ্ট্রায়ত্তকরণ। বিপুল অর্থ ক্ষতিপূরণ পেয়ে নিজেদের ধুঁকতে থাকা সংস্থাগুলিকে রাষ্ট্রের হাতে অর্পণ করে স্বস্তির শ্বাস ফেলল মালিকপক্ষ। জনগণের করের টাকার অপচয় করে সেই সব ডুবন্ত সংস্থাগুলির রাষ্ট্রায়াত্তকরণ করে তৎকালীন শাসকদল ভোট-বৈতরণী পেরলো আর অর্থনীতির ক্ষেত্রে সৃষ্টি হলো এক নতুন শ্রেণীর। ট্রেড ইউনিয়ন লিডার নামক সেই নতুন শ্রেণী রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার কর্মীসমূহের ওপর ছড়ি ঘোরানোর পরিস্থিতিপ্রদত্ত অধিকারের অসদ্ব্যবহার করে ঢুকে পড়লো দুর্নীতির বৃত্তে। দু'দশক ধরে জাতীয় অর্থনীতিতে অবস্থিত রাজনীতিবিদ-আমলা-ব্যবসায়ী দুষ্ট-ত্রয়ের বদলে রাজনীতিবিদ-আমলা-ব্যবসায়ী-ট্রেড ইউনিয়ন লিডার এই দুষ্ট-চতুষ্টয়ে পরিণত হলো।

জাতীয় অর্থনীতির এই গড্ডলিকা-প্রবাহ ধাক্কা খেল ১৯৯১ সালে, সোভিয়েত-পতনের সঙ্গে সঙ্গে সোভিয়েত-নির্ভর সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির পূতিগন্ধময় অস্তিত্ব বিলুপ্ত হলো গোটা দুনিয়া থেকে। ধ্বংসপ্রাপ্ত সোভিয়েত ইউনিয়নের বদলে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রকে এবার আদর্শ করলো জাতীয় নীতিনির্ধারকরা। অবশ্য মিশ্র অর্থনীতির মিশ্র ভাবটি অটুট রইলো, শুধু সমাজতান্ত্রিক ঝোঁক ধনতান্ত্রিক ঝোঁকে বদলে গেল। অর্থাৎ এখনও সরকারি-বেসরকারি উভয় সংস্থাই অর্থনীতিতে থাকলো কিন্তু এখন তাদের মধ্যে থাকলো প্রতিযোগিতা। বিনিয়োগের এবং বিপণনের ক্ষেত্র নিয়ন্ত্রণমুক্ত হলো, লাইসেন্স রাজ ঠাঁই পেল ইতিহাসের পাতায়। তাবলে দুর্নীতি দূর হলো না। দুষ্ট-চতুষ্টয়ের প্রাধান্য অটুট থেকে শুধু দুর্নীতির পদ্ধতি বদল হলো। কারণ এরপর দেখা গেল উলটপুরাণ। বেসরকারি সংস্থার রাষ্ট্রায়াত্তকরণের বদলে এবার শুরু হলো রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার বিলগ্নিকরণ। লাভজনক রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাকে অলাভজনক দেখিয়ে স্বল্পমূল্যে বিক্রি করে দেওয়ার নয়া দুর্নীতি চালু হলো। আমলাতন্ত্র লাইসেন্স রাজের বদলে হিসেবে কারচুপিকে দুর্নীতির নতুন হাতিয়ার হিসেবে গ্রহণ করলো। সংস্থার বিলগ্নিকরণ রোধ করার নামে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সাজানো লড়াই করে পরে উপযুক্ত অর্থের বিনিময়ে বিলগ্নিকরণ মেনে নেওয়ার মাধ্যমে নিজের দুর্নীতিক্ষেত্র বজায় রাখলো ট্রেড ইউনিয়ন লিডাররাও। তবে হ্যাঁ, বাজারে প্রতিযোগিতা থাকায় শিল্প ও পরিষেবাক্ষেত্রের গুণগত মানের উৎকর্ষ সাধিত হলো। উদ্ভাবনী শক্তির বিকাশও ঘটলো। রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ না থাকায় নতুন বিনিয়োগকারীদের উঠে আসার পথও প্রশস্ত হলো কিন্তু উপযুক্ত পরিকাঠামো তৈরি না থাকায় ও সরল করবিধি না থাকায় বিনিয়োগকারীরা উঠে আসতে ব্যর্থ হলো। দেশের মাথাপিছু গড় আয়ের (জিডিপি) বৃদ্ধির হার সামান্য বৃদ্ধি পেলেও অর্থাৎ জাতীয় অর্থনীতির সামান্য শ্রীবৃদ্ধি ঘটলেও সেই সুফল পুরোটাই চলে গেল দুষ্ট-চতুষ্টয়ের গ্রাসে। সাধারণ মানুষ রইল বঞ্চিতই। পরিকাঠামো ক্ষেত্রে কিছুটা অন্যরকম চিন্তা হয়েছিল প্রথম এনডিএ আমলে। সোনালি স্বর্ণ চতুর্ভুজ ইত্যাদি নানারকম পরিকল্পনার দ্বারা দেশের পরিবহণের হাল ফেরানোর এবং নতুন বিনিয়োগকারীদের উঠে আসার পথ তৈরির চেষ্টা হয়েছিল। দুষ্ট-চতুষ্টয়ের কায়েমি স্বার্থে ঘা লেগেছিল ফলে হাকিম বদলাতে দেরি হয়নি। তার পরের দশ বছর পুতুল হাকিম আর দুষ্ট-চতুষ্টয়ের অন্তরাত্মার হুকুমে দুর্নীতি হয়েছিল দুর্নিবার। জর্জরিত জনসাধারণ হাকিম বদলেছিল সোৎসাহে। নতুন হাকিমের হুকুমে দুর্নীতি-দৈত্য আজ বোতলবন্দি। সরাসরি অ্যাকাউন্টে টাকা ট্রান্সফার, আধার-প্যান সংযোগ সাধন, সুইজারল্যান্ড সরকারের থেকে তথ্য দেওয়ার প্রতিশ্রুতি আদায়, বিমুদ্রীকরণ ইত্যাদি নানান অস্ত্রের আঘাতে সে আজ ঘায়েল। ঐতিহাসিক জিএসটি চালুর মাধ্যমে কর ব্যবস্থার সরলীকরণ এবং পরিকাঠামোর অকল্পনীয় বৃদ্ধি ভারতীয় অর্থনীতিকে ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির সুফল গ্রহণে সক্ষম করে তুলেছে।

১৫ই আগস্ট
বিশেষ সংখ্যা

দেশ দুর্নীতিমুক্ত হলো। তুলনামূলকভাবে কিছুটা অর্থনৈতিক শ্রীবৃদ্ধিও ঘটলো। জনসাধারণ কিছুটা হলেও 'আচ্ছে দিন'-এর স্বাদ পেল। কিন্তু এরপর কী? ১৯৯১-এর সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির মতো আজকের পৃথিবীতে ধনতান্ত্রিক অর্থনীতিও তো সঙ্কটে। জাতীয় অর্থনীতিকে বাঁচাতে গেলে তো এই জীর্ণ তরণীকেও ত্যাগ করতে হবে। এবার বিকল্প কী? বিদেশি অর্থনীতির অক্ষম ও সক্ষম অনুসরণ করে সাতটি দশক তো অতিক্রম করা গেল। কিন্তু হিসেবের খাতা খুলে দেখা গেল হাতে রয়েছে পেন্সিল। বাঁদিকে হাঁটার প্রথম চুয়াল্লিশ বছরে দেশের মাথাপিছু গড় আয়ের (জিডিপি) বৃদ্ধি ছিল বছরে ৩.৫ থেকে ৪ শতাংশ। ডানদিকে পা ফেলার পরের ২৬ বছর জিডিপি'র বৃদ্ধির হার দাঁড়াল বছরে ৫ থেকে ৮ শতাংশ। আমাদের সঙ্গে একই সময়ে যাত্রা শুরু করেছিল আণবিক বোমা বিধ্বস্ত জাপান এবং নবগঠিত ইজরায়েল। আজ মাথাপিছু গড় আয়ের (ডিডিপি) দিক দিয়ে তারা বিশ্বের শীর্ষস্থানীয়। গত সাত দশকে জাপানের জিডিপি'র বৃদ্ধির হার ছিল বছরে গড়ে ১০ শতাংশ আর ইজরায়েলের ৮ থেকে ৯.৫ শতাংশ। এক যাত্রায় পৃথক ফলের একটাই কারণ, জাপান এবং ইজরায়েল নিজেদের দেশের উন্নতির জন্য নিজেদের দেশের উপযোগী অর্থনীতিই গ্রহণ করেছিল আর অর্থনীতি শাস্ত্রের আবিষ্কর্তা দেশ ভারতবর্ষ নিজেদের দেশের উন্নতির জন্য মুখাপেক্ষী হয়েছিল বিদেশের। আজ স্বাধীনতার পুণ্যলগ্নে দেশের নীতিনির্ধারকদের কাছে একটাই প্রার্থনা বামপথে বা ডানপথে না হেঁটে একটু সোজপথে হাঁটুন। সমাজতান্ত্রিক বা ধনতান্ত্রিক উভয়প্রকার অর্থনীতির পথ পরিত্যাগ করে যে অর্থনীতির ওপর ভিত্তি করে ভারত পরাধীনতার আগে দু'সহস্রাব্দ ধরে বিশ্বের সমৃদ্ধতম দেশ হিসেবে পরিগণিত ছিল সেই স্বদেশি অর্থনীতিকে গ্রহণ করুন তবেই অর্থনৈতিকভাবে 'ভারত আবার জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে।' ■

১৫ই আগস্ট
বিশেষ সংখ্যা

সত্তর বছরে কাশ্মীর সমস্যা

নতুন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে দেখতে হবে

দিব্যজ্যোতি চৌধুরী

দেশের স্বাধীনতার ৭০টা বছর পেরিয়ে গেল কিন্তু কাশ্মীর আজও অশান্তই রয়ে গেল। তাঁর আর পাঁচটা ভুল সিদ্ধান্তের মতো কাশ্মীর নিয়েও যে ঐতিহাসিক ভুল সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু, এক কথায় তারই দীর্ঘকালীন ফলশ্রুতি হলো আজকের কাশ্মীর পরিস্থিতি। ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেনডেন্স অ্যাক্ট

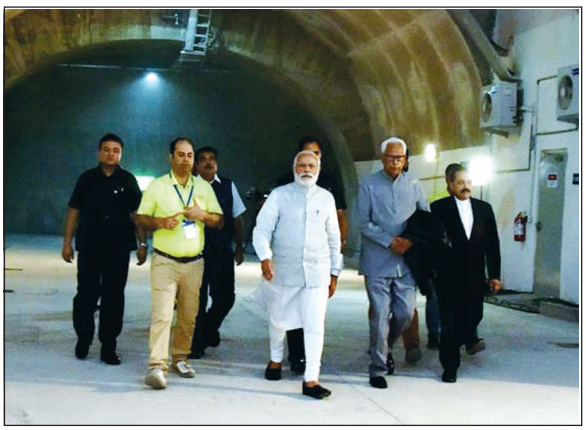

সুড়ঙ্গপথ উদ্বোধনে নরেন্দ্র মোদী।

অনুসারে 'ইনস্ট্রুমেন্ট অব অ্যাকশেসন'-এ সই করে কাশ্মীরের রাজা হরি সিংহ ভারতের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গি হয়ে যেতেই লিখিত ভাবে চেয়েছিলেন। কিন্তু নেহরুর শেখ আবদুল্লার প্রতি ব্যক্তিগত সখ্য ও তাঁর (আবদুল্লার) কাশ্মীরি মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখতে অগ্র-পশ্চাৎ না ভেবে এক আধা-স্বাধীন প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শেখকে মেনে নিয়ে একটি দেশের মধ্যে আর একটি মনগড়া আধা-স্বাধীন রাজ্য তৈরি করলেন।

কিন্তু সেসব ঘটনা আজকে ইতিহাস মাত্র। সমস্যাটা এমন একটা জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে যে আমাদের সামনে আজ একমাত্র ভাবার বিষয় হলো কীভাবে এই সমস্যা তাড়াতাড়ি মেটানো যায়। কাশ্মীর সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক— দুটি পরস্পর সম্পর্কিত জটিলতা আছে যার জেরে সংঘাত অব্যাহত রয়েছে। বাহ্যিক প্রতিবন্ধকতা হলো, পাকিস্তান যেন তেন প্রকারে কাশ্মীরকে ছিনিয়ে নিতে চায়। অভ্যন্তরীণ জটিলতা আরও গভীর। কাশ্মীরের মুসলমানরা আবেগের দিক থেকে সম্পূর্ণভাবে ভারতের জাতীয় মূলস্রোতের সঙ্গে একাত্ম নয়। যদি ভারত এই দ্বিতীয় সমস্যাটা সঠিকভাবে মোকাবিলা করতে পারে তাহলে, প্রথম সমস্যাটা স্বাভাবিক ভাবেই তার গুরুত্ব হারিয়ে ফেলবে।

কাশ্মীরে আজকাল এক নতুন ধরনের অশান্তি দেখা দিয়েছে। চূড়ান্ত অশান্ত এবং এতদঞ্চলে জনপ্রিয় এই প্রতিষ্ঠান বিরোধী আন্দোলন হিজবুল কম্যান্ডার বুরহান ওয়ানির মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে আরও মারাত্মক আকার নিয়েছে। নিরাপত্তারক্ষীদের সঙ্গে পাথর ছোঁড়া কাশ্মীরিদের এই নিত্যকার সংঘর্ষে আজ পর্যন্ত ৯০ জন মারা গেছে। এরা যে বেশিরভাগ তরুণ-তরুণী তাই নয়, এদের মধ্যে মধ্যবিত্ত শিক্ষিত ছেলে-মেয়েরাও রয়েছে। পাকিস্তানি শাকরেদদের কাছে অনেকদিনের অনুগত বিচ্ছিন্নতাবাদী নেতারা অর্থের বিনিময়ে যুবকদের এই কাজে প্ররোচিত করে কাশ্মীরকে চূড়ান্ত অশান্ত করে রেখেছে। তাদের ডাকা ঘন ঘন বন্‌ধে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। নিরাপত্তাবাহিনীর সমস্ত সরঞ্জাম এবং কনভয় এখন জেহাদিদের আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু হয়ে উঠেছে। এই কৌশলের অঙ্গ হিসেবে পাকিস্তান নিয়ন্ত্ররেখা ও আন্তর্জাতিক সীমানা বরাবর তাদের শয়তানি কাজকারবারকে জোরদার করেছে। তার সঙ্গে চিন্তা বাড়িয়েছে উপত্যকায় ইসলামি মৌলবাদের উত্থান। এক সময় সুফি ইসলামের প্রভাবে উপত্যকায় ধর্মীয় সহিষ্ণুতা ছিল যার ফলে হিন্দু-মুসলমান একসঙ্গে শান্তিতে থাকতে পারতো। দুর্ভাগ্যজনকভাবে কিছু বছর ধরে সহিষ্ণু সুফিবাদ প্রভাবিত হানাফি ধ্যানধারণাকে ছাপিয়ে কট্টর ওয়াহাবি চিন্তাধারা সেখানে গেঁড়ে বসেছে। মফস্‌সল থেকে শুরু করে শহরের মসজিদগুলিতেও আজ কট্টর মৌলবাদের রমরমা। একটা বড় সংখ্যার সাধারণ মুসলমানদের আচরণের সঙ্গে সন্ত্রাসবাদীদের আচরণের অদ্ভুত মিল লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এখন প্রশ্ন হলো, ভারত সরকার কীভাবে এদের জাতীয় জীবনের মূলস্রোতে ফিরিয়ে আনবে? আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে অশান্ত উপত্যকাকে কী ছন্দে ফেরানো সম্ভব? শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিকাঠামো— এসব ক্ষেত্রে আরও বিনিয়োগ করে কাশ্মীরি যুবকদের জন্য বেশিমাত্রায় কর্মসংস্থান তৈরি করতে পারলে তারা কি জঙ্গি হবার রাস্তা থেকে সরে আসবে? এসব বিকল্প ভাবনার ক্ষেত্রে বর্তমান কেন্দ্র সরকার যথেষ্ট ইতিবাচক ভূমিকা নিয়ে চলেছে। হাল আমলেই কাশ্মীরে এশিয়ার দীর্ঘতম টানেলের উদ্বোধন করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী কাশ্মীরি যুবকদের উদ্দেশে বার্তা দিয়েছেন যে— এবার যুবকদেরকেই স্থির করতে হবে, উগ্রবাদ না উন্নয়ন, কোনটা তারা চায়। অন্তর্দ্বন্দ্বের কারণে বাংলাদেশ ও মায়ানমার থেকে রোহিঙ্গা মুসলমানরা জম্মু-কাশ্মীরে ঘাঁটি গেঁড়েছে। এতে অল্পদিনেই যে সেখানে সাম্প্রদায়িক ও নিরাপত্তা সমস্যা বাড়বে তা হলফ করে বলা যায়। ১৯৪৭ সাল থেকে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আসা উদ্বাস্তুরা যেখানে আজও নাগরিক পরিচয় পাননি সেখানে, রোহিঙ্গারা জম্মু-কাশ্মীরের নাগরিকত্ব জোগাড় করে ফেলেছে। রাজ্য ও কেন্দ্র সরকার উভয়কেই এই বিষয়টা দ্রুততা ও স্বচ্ছতার সঙ্গে সমাধান করতে হবে। জম্মু কাশ্মীরের ভারতভুক্তির বিষয়টা চূড়ান্ত ও অসংশোধনীয় হওয়া সত্ত্বেও কীভাবে অচিরে ভারতের সঙ্গে এর মানসিক একাত্মতা তৈরি করা যায় সেই বিষয়টা কিন্তু যথেষ্ট জটিল। সেই কারণেই জম্মু-কাশ্মীর নীতিতে সরকারকে কতগুলি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ নিতে হবে। ■

১৫ই আগস্ট
বিশেষ সংখ্যা

ঘরে-বাইরে চাপের মুখে সন্ত্রস্ত সন্ত্রাসবাদীরা

সাধন কুমার পাল

বহু রক্ত ও অমূল্য প্রাণের আহুতি দানের বিনিময়ে অর্জিত রক্তরঞ্জিত স্বাধীনতা রক্ষা করাই এখন বড় চ্যালেঞ্জ। স্বাধীনতা রক্ষার জন্য বিগত ৭১ বছর ধরে কম রক্ত ঝরেনি। ৪৭-এর পর স্বাধীনতা রক্ষার জন্যই চীন ও পাকিস্তানের মতো প্রতিবেশীর সঙ্গে লড়তে হয়েছে একাধিক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ। ঘোষিত যুদ্ধ থামলেও ভারতকে নিজের দেশের ভেতরেই নিরন্তর লড়ে যেতে হচ্ছে এক অঘোষিত যুদ্ধ। বিগত পঞ্চাশ বছর ধরে লড়তে হচ্ছে চীনের মদতপুষ্ট অতিলাল ভাবধারার নকশালপন্থীদের সঙ্গে, চীনা মদতপুষ্ট অসমের আলফা, নাগাল্যান্ডের এনএসসিএন-সহ বিভিন্ন আঞ্চলিক সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীর সঙ্গে। রিপোর্ট বলছে, প্রত্যক্ষ যুদ্ধে না জড়িয়ে প্রতিদ্বন্দ্বী ভারতকে দুর্বল করতে, ব্যতিব্যস্ত রাখতে রাষ্ট্রীয় নীতির অঙ্গ হিসেবেই চীন এদেশের বিভিন্ন আঞ্চলিক অসন্তোষকে নানা ভাবে মদত দিয়ে থাকে। পাশাপাশি প্রত্যক্ষ ভাবে যুদ্ধে না জড়িয়ে ভারতকে ধ্বংস করতে ইসলামিক সন্ত্রাসবাদীদের অর্থ দিয়ে প্রশিক্ষণ দিয়ে ছদ্ম যুদ্ধ চালানো প্রতিবেশী পাকিস্তানেরও রাষ্ট্রীয় নীতি।

প্রতিনিয়ত নির্দোষ নাগরিকের রক্ত ঝড়ানোর বিভীষিকাময় আতঙ্ক ও আঞ্চলিক অস্থিরতা ছাড়াও চীন ও পাকিস্তান পরিচালিত ছদ্ম যুদ্ধের পরিণাম উঠে আসছে বিভিন্ন রিপোর্টও। ২০১৪ সাল ও ২০১৫ সালের নভেম্বরে ওয়াশিংটনের 'ইনস্টিটিউট অব ইকনমিক্স অ্যান্ড পিস' প্রকাশিত 'গ্লোবাল টেরোরিজম ইনডেক্স' অনুসারে গোটা বিশ্বে ১৬৫টি দেশের মধ্যে জঙ্গিদের পছন্দের তালিকায় ভারত ছ' নম্বরে। ইরাক, আফগানিস্থান, নাইজেরিয়া পাকিস্তান ও সিরিয়ার পরেই ভারতের স্থান। সাউথ এশিয়া টেরোরিজম পোর্টাল প্রকাশিত তথ্য অনুসারে বর্তমানে ভারতে সক্রিয় নিষ্ক্রিয় মিলে মোট ২২২টি সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠী কাজ করছে। সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠী সম্পর্কে এই সংখ্যা তত্ত্ব বলছে বিদেশি মদত, ভোটব্যাঙ্ক রাজনীতি, সংখ্যালঘু তোষণ এবং দুর্নীতির দৌলতে ভারত স্বাধীনতার শত্রু সন্ত্রাসবাদীদের অন্যতম নিশানায় পরিণত হয়েছে।

স্বাধীনতার শত্রুরা সবাই যে বন্দুক হাতে লড়ছে তা কিন্তু নয়। 'প্রগতিশীলতার' ছদ্মবেশে চীনা ও পাকিস্তানি এজেন্টরা মত প্রকাশের স্বাধীনতা, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা, মুক্ত চিন্তার পরিসরকে পূর্ণ মাত্রায় ব্যবহার করে এদেশের রাজনৈতিক সামাজিক সাংস্কৃতিক পরিবেশকে কলুষিত করে নৈতিক সমর্থন যোগাচ্ছে ইসলামের নামে, সাম্যবাদের নামে রক্তের নেশায় উন্মত্ত জল্লাদদের। ফলে সরকারি অর্থে চলা জওহরলাল নেহরু কিংবা যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো ঐতিহ্যবান প্রতিষ্ঠানগুলিতে ছাত্র নামধারী একদল উন্মাদ দেশবিরোধী স্লোগান তোলার সাহস পাচ্ছে। সুপ্রিমকোর্টের রায়ে আফজল গুরু, ইয়াকুব মেননের ফাঁসিকে জেএনইউ-এর চীনা ও পাকিস্তানি এজেন্টরা জুডিশিয়াল কিলিং বলে তুলে ধরতে চাইছে। সন্ত্রাসবাদীদের বুলেটে সুরক্ষা বাহিনীর জওয়ানদের ক্ষয়ক্ষতি হলে এই ছাত্রেরা ক্যাম্পাসে বিজয় উৎসব পালন করে বিপরীত ঘটনা ঘটলে মানবাধিকার নিয়ে হইচই বাঁধায়।

২৬/১১-র মুম্বই হামলার পর কংগ্রেস নেতা দিগ্বিজয় সিংহ পাকিস্তানের সুরে সুর মিলিয়ে আঙুল তুলেছিলেন আর এস এস-

ছত্তিশগড়ে মাওবাদী জঙ্গির আত্মসমর্পণ

বিজেপির দিকে। লস্কর-ই-তৈইবার মহিলা জঙ্গি ইশরাত জাহান হত্যার পর ধর্মনিরপেক্ষতার ধ্বজাধারী সমস্ত রাজনৈতিক দল ঘিরে ধরে ছিল গুজরাট সরকারকে। জেএনইউয়ে দেশ বিরোধী স্লোগান তোলার দায়ে অভিযুক্ত উমর খালিদ, অনির্বাণ ভট্টাচার্য, কানাইয়া কুমারদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে গেলে রাহুল গান্ধী, অরবিন্দ কেজরিওয়াল, সীতারাম ইয়েচুরির মতো স্বঘোষিত ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদীরা ঘিরে ধরেছিল কেন্দ্রের মোদী সরকারকে। এরকম অজস্র উদাহরণ দেওয়া যাবে যা থেকে বলা যাবে রক্তপিপাসু জল্লাদরা সরাসরি নৈতিক সমর্থন পাচ্ছে এদেশের সংখ্যালঘু তোষক রাজনৈতিক দলগুলির কাছ থেকে। আসলে স্বাধীনতা প্রাপ্তির সাত দশক ধরে এদেশের রাজনৈতিক নেতারা দেশদ্রোহী সন্ত্রাসবাদীদের পাশে দাঁড়াতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠা বোধ করে

জঙ্গি হানায় নির্দোষ মানুষ ও নিরাপত্তারক্ষীদের মৃত্যুর হার				
বছর	নির্দোষ মানুষ	নিরাপত্তা রক্ষী	সন্ত্রাসবাদী	মোট
২০০৫	১২১২	৪৩৭	১৬১০	৩২৫৯
২০০৬	১১১৮	৩৮৮	১২৬৪	২৭৭০
২০০৭	১০১৩	৪০৭	১১৯৫	২৬১৫
২০০৮	১০০৭	৩৭৪	১২১৫	২৫৯৬
২০০৯	৭২০	৪৩১	১০৮০	২২৩১
২০১০	৭৫৯	৩৭১	৭৭২	১৯০২
২০১১	৪২৯	১৯৪	৪৫০	১০৭৩
২০১২	২৫২	১৩৯	৪১২	৮০৩
২০১৩	৩০৩	১৯৩	৩৮৮	৮৮৪
২০১৪	১০৭	১৬১	৪০৮	৯৭৬
২০১৫	১৮১	১৫৫	৩৮৬	৭২২
২০১৬	২০২	১৮০	৫১৬	৮৯৮
২০১৭ (২, জুলাই পর্যন্ত)	১১১	১১৫	২১১	৪৩৭

(সূত্র : গ্লোবাল টেররিজম ইনডেক্স)

না। ২০১৪ সালে কেন্দ্রে নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে শক্তিশালী সরকার গঠনের পর থেকে এখনো পর্যন্ত মুম্বই হামলার মতো বড় কোনো সন্ত্রাসবাদী হামলা ঘটেনি। বহুমুখী গঠনমূলক পদক্ষেপ নেওয়া সত্ত্বেও কাশ্মীরের অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি বলছে পাকিস্তানি মদতপুষ্ট ইসলামিক জঙ্গিরা উপত্যকায় অন্তিম লড়াই লড়ছে। কিন্তু পাকিস্তানের মাটিতে ঢুকে সার্জিক্যাল স্ট্রাইকের মতো নজিরবিহীন পদক্ষেপ নেওয়া থেকে শুরু করে, আমেরিকাকে সঙ্গে নিয়ে ভারত যেভাবে হাফিজ সৈয়দ, সালাউদ্দিনের মতো পাকিস্তান ভিত্তিক সন্ত্রাসবাদী ও লস্কর-তৈবা কিংবা হিজবুল মুজাহিদিনের মতো বিভিন্ন সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীকে আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদী তালিকাভুক্ত করে, সন্ত্রাসবাদের পালক পোষক দেশ হিসেবে যেভাবে পাকিস্তানকে ঘিরে ধরছে, তা থেকে স্পষ্ট অদূর ভবিষ্যতে কাশ্মীরে শান্তি প্রতিষ্ঠা হবেই।

পরিসংখ্যানও বলছে, ভারত এখন পরিস্থিতি বদলাতে শুরু করেছে। 'গ্লোবাল টেরোরিজম ইনডেক্স' অনুসারেও ভারতের অবস্থার উন্নতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে। ২০১৬ সালের 'গ্লোবাল টেরোরিজম ইনডেক্স' অনুসারে ভারতের স্থান অষ্টম। সাউথ এশিয়া টেরোরিজম পোর্টালের (এসএটিপি) তথ্য অনুসারে ২০১৬ সালে সন্ত্রাসবাদী হানা ভারতে নাটকীয় ভাবেই সর্বনিম্ন। নকশাল হানায় যেখানে প্রতি বছর গড়ে মৃত্যুর সংখ্যা ছিল হাজারের উপরে ২০১৫ সালে তা কমে দাঁড়িয়েছে ২৫১ জনে। এসএটিপি-র তথ্য ভাণ্ডার থেকে প্রাপ্ত সারণি থেকে স্পষ্টই ২০১৪ সাল থেকে ভারতের সন্ত্রাসবাদী হানায় মৃত্যুর হার উল্লেখ যোগ্য ভাবে কমে আসার প্রবণতা লক্ষ করা যাচ্ছে।

১৫ই আগস্ট বিশেষ সংখ্যা

এটা স্পষ্ট বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারের চীন ও পাকিস্তানের মতো সন্ত্রাসে মদতদানকারী দেশ, কুখ্যাত সন্ত্রাসবাদী ও তাদের সংগঠনগুলিকে আন্তর্জাতিক ভাবে নরমে গরমে কোণঠাসা করার নীতি, সেই সঙ্গে আঞ্চলিক বৈষম্য দূর করার জন্য 'সবকা সাথ সবকা বিকাশ' নীতি সন্ত্রাসবাদীদের মূলে আঘাত হানছে। আরও লক্ষণীয় যে সন্ত্রাসবাদী হানায় মৃত্যুর হার কমে আসার সঙ্গে সঙ্গে রাজনীতির মূলস্রোতেও কমছে আঞ্চলিক দলগুলির প্রভাব। আসমুদ্রহিমাচল সর্বত্রই জাতীয় দল হিসেবে বিজেপিই যেন হয়ে উঠছে আঞ্চলিক আশাআকাঙ্ক্ষা পূরণের মাধ্যম। স্বাধীনতা লাভের পর এই প্রথমবার বোধহয় স্বাধীনতার শত্রুদের নিশ্চিহ্ন করে স্বাধীনতা অর্থবহ করে তোলার বড় সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। তবে স্বাধীনতা রক্ষার সৈনিক হিসেবে সর্বস্তরের মানুষের অংশগ্রহণ ছাড়া শুধুমাত্র সরকারি প্রয়াসে দারিদ্র্য, বেকারি, সন্ত্রাসের মতো স্বাধীনতার শত্রুদের সম্পূর্ণভাবে নির্মূল করা সম্ভব নয়। ■

স্বাধীনতার ৭০ বছরে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন—

ARSHAD ALAM

Minority Morcha

All India Secretary (BJP)

পশ্চিমবঙ্গের সীমান্ত এলাকায় জেহাদি আক্রমণের খণ্ডচিত্র

বিমল প্রামাণিক

উত্তর ২৪ পরগনা জেলার সীমান্ত মহকুমা বসিরহাট এখন ভারতের সংবাদমাধ্যমের কাছে খুবই পরিচিত নাম। সাম্প্রতিককালে (জুন-জুলাই, ২০১৭) ইসলামি জেহাদি মুসলমানদের আক্রমণে বসিরহাট মহকুমা প্রায় বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যম এই আক্রমণকে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হিসেবে বারবার অভিহিত করলেও স্থানীয় সংবাদমাধ্যম এটাকে চাপা দিতেই ব্যস্ত হয়ে ওঠে। রাজ্য সরকারের ভূমিকাও তথৈবচ। এই মহকুমার দুটি গ্রাম গুণরাজপুর ও কেওসা। প্রথমটি পশ্চিমবঙ্গ-বাংলাদেশ সীমান্তের এক কিলোমিটারের মধ্যে, স্বরূপনগর থানা থেকে ১.২ কিলোমিটার দূরে। আর কেওসা গ্রামটি সীমান্ত থেকে ১৫ কিলোমিটার এবং বাদুড়িয়া থানা থেকে ৭ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। দেশ ভাগের পূর্বে এ দুটি গ্রামেই ছিল ব্যাপক মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠতা। দেশভাগজনিত কারণে খুলনা জেলা থেকে প্রচুর সংখ্যক হিন্দু-পরিবার ২৪ পরগনা জেলার মুসলমানদের সঙ্গে সম্পত্তি বিনিময় করে এখানে থিতু হন আবার জমিজমা কিনেও মুসলমান-অধ্যুষিত গ্রামগুলিতে অনেকে বসবাস করতে থাকেন। গুণরাজপুর এবং কেওসা এমনই দুটি গ্রাম। ফলে দেশভাগের পরে ওইসব গ্রামে ধর্মীয় জনসংখ্যার অনুপাতের পরিবর্তন ঘটে যায়।

উল্লেখ্য যে, পুর্ব-পাকিস্তান এবং বাংলাদেশ থেকে গুণরাজপুরে ৪৯টি এবং কেওসায় ৫১টি হিন্দু পরিবার উদ্বাস্তু হিসেবে বসতি স্থাপন করেছিল। কিন্তু ১৯৭১ সাল থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত মাত্র ৩০ বছরে স্থানীয় মুসলমানদের (অনেক ক্ষেত্রে বাংলাদেশি মুসলমানদের সহযোগিতায়) আগ্রাসন ও অত্যাচারে গুণরাজপুর গ্রাম থেকে ৩০টি এবং কেওসা গ্রাম থেকে ৫৬টি হিন্দুপরিবার উচ্ছেদ হয়ে অন্যত্র চলে যেতে বাধ্য হয়েছে। এবারের জেহাদি আক্রমণে কেওসা বাজার সম্পূর্ণ লুটপাট ও ভস্মীভূত হয়েছে। কেন হিন্দুদের উত্তর ২৪ পরগনার বিভিন্ন এলাকা ছেড়ে চলে যেতে হচ্ছে, তার দু-একটি উদাহরণ এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন।

১৫ই আগস্ট
বিশেষ সংখ্যা

বিশ্বনাথ মণ্ডল পিতা নগেন্দ্রনাথ মণ্ডল, গ্রাম : পশ্চিম পোলতা, ডাকঘর : গোবিন্দপুর, থানা : স্বরূপনগর, উত্তর চব্বিশ পরগনা। তিনি গ্রাম ত্যাগ করে ১৯৯৯ সালে নলাবরায়, (ডাকঘর— সারাপুল) নতুনভাবে বসতি স্থাপন করেন। উচ্ছেদ হওয়ার কাহিনি নীচে বর্ণনা করা হলো। স্থানীয় মুসলমানরা ডাকাতির অছিলায় হিন্দু বাড়িগুলিতে প্রায়শই বৌ-মেয়েদের শ্লীলতাহানি ও ধর্ষণ করে থাকে। এমনকী সাধারণ ঘটনা নিয়েও মুসলমানরা সঙ্ঘবদ্ধভাবে হিন্দুদের বাড়ি-ঘরে ও মহিলাদের উপর আক্রমণ করে থাকে। এধরনের ঘটনা থানায় জিডি করলেও পুলিশ কোনো ব্যবস্থা নেয় না। হোসেন সরদার নামে এক ব্যক্তি— যে ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় রাজাকার ছিল এবং পাকিস্তান বাহিনীর সহযোগী হয়ে অনেক হিন্দু খুনের ও বাড়িঘর লুটের অভিযোগে অভিযুক্ত। এখানে এসে ডাকাতি, ধর্ষণ ও হিন্দুদের উপর অত্যাচারের ঘটনায় পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করে। কিন্তু শাসক দলের স্থানীয় নেতাদের হস্তক্ষেপে সে মুক্ত হয়ে যায় এবং তার দাপট আরও বেড়ে যায়। একদিন রাতে বিশ্বনাথবাবুর অনুপস্থিতিতে স্থানীয় কয়েকজন মুসলমান দুষ্কৃতী তার স্ত্রী ও কন্যাকে জোরপূর্বক বাড়ি থেকে অপহরণ করে নিয়ে যায়। কয়েকজন প্রতিবেশী ঘটনা জানতে পেরে ধাওয়া করে দুষ্কৃতীদের ঘিরে ফেলে। ফলে মহিলাদের ছেড়ে দিয়ে দুষ্কৃতীরা পালিয়ে যায়। বিশ্বনাথবাবু স্থানীয় পঞ্চায়েতে জানান এবং থানায় জিডি করেন (জি.ডি. নং ৩৩৫/৯১— ১১.০৩.১৯৯৯)। কিন্তু পঞ্চায়েত এবং পুলিশ অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থাই নেয়নি। এরপর ওই গ্রামের বিশ্বনাথ মণ্ডল, বিনয় সরকার-সহ ৬টি হিন্দু পরিবার এসডিও বসিরহাটের কাছে সমস্ত ঘটনার বিবরণ দিয়ে একটি মেমোরেন্ডাম জমা দেয়। কিন্তু সাড়ে তিন বছরেও এসডিও'র তরফে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। শাসক এবং বিরোধী দলের সকল নেতাই মুসলমান হওয়ায় এ বিষয়ে ব্যবস্থা নিতে কেউই কোনো আগ্রহ দেখায়নি। এই অবস্থায় বিশ্বনাথবাবু-সহ গ্রামের অনেক পরিবার জলের দরে বাড়ি-ঘর, জমি-জমা বেচে দিয়ে গ্রাম ত্যাগ করতে বাধ্য হয়। এধরনের হিন্দু বিতাড়নের বহু ঘটনা সীমান্ত অঞ্চলে খোঁজ করলেই পাওয়া যাবে। বসিরহাট, স্বরূপনগর, বাদুড়িয়া প্রভৃতি অঞ্চলে যে জেহাদি হাঙ্গামার ঘটনা দেখা গেল— অনেকদিন ধরেই তা ধিকিধিকি জ্বলছিল— সরকার ধামাচাপা দিয়ে রেখেছিল— এবার আর তা সম্ভব হয়নি। পশ্চিমবঙ্গের অনেকাঞ্চলেই

এখন সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার খবর প্রকাশ্যে আসছে। তোষণের রাজনীতি করে আর চাপা দেওয়া যাচ্ছে না।

আজকে স্বরূপনগর থানার সীমান্তগ্রাম গোবিন্দপুরে পিচরাস্তায় ধারে এক কাঠা জমির দাম ৪-৬ লক্ষ টাকা। কারা কিনছে ওই বহুমূল্য জমি? জেলা সদর বারাসতের জমির মূল্যও ওই দামের কাছে হার মানছে। শুধু গোরুপাচারের কালো টাকাই কী জমির দাম এত বাড়িয়ে দিয়েছে, না বাংলাদেশি টাকার দাপটে পশ্চিমবঙ্গ বিক্রি হয়ে যাচ্ছে? এ বিষয়টি সরকারের দেখা উচিত। ভারতের স্বাধীনতা পরবর্তীকালে ১৯৭০ সাল পর্যন্ত হিন্দু-মুসলমান জনসংখ্যার অনুপাতে তেমন কোনো পরিবর্তন নেই। কিন্তু ১৯৭১ সাল থেকে হঠাৎ করেই হিন্দু জনসংখ্যা বেড়ে যাওয়ার কারণ হলো বাংলাদেশের মুক্তি-সংগ্রামের প্রাক্কালে বহু হিন্দু পরিবার উদ্বাস্তু হয়ে পশ্চিমবঙ্গে এসে আশ্রয় নিয়েছিলেন। তাদের অনেকেই স্থায়ীভাবে ওই গ্রামগুলিতে থেকে যান। ফলে ১৯৭১-১৯৯০ পর্বে হিন্দু জনসংখ্যার অনুপাত বৃদ্ধি পায়। কিন্তু ১৯৯১ সালের পর থেকে শাসক দলের মদতে বাংলাদেশি মুসলমান দুষ্কৃতীরা স্থানীয় মুসলমানদের সহায়তায় হিন্দু-অধ্যুষিত গ্রামগুলিতে ব্যাপক অত্যাচার শুরু করে। মূলত সীমান্ত অঞ্চল থেকে হিন্দুদের উৎখাত করার লক্ষ্য নিয়ে মুসলমানরা এই কাজ করতে থাকে। গোরু-সহ অন্যান্য চোরাচালান ব্যবসা মুসলমানদের নিয়ন্ত্রণে আনাই ছিল এর প্রধান উদ্দেশ্য। হিন্দু বাড়িগুলিতে ডাকাতি, লুট, খুন, নারীধর্ষণ, গোরুচুরি-সহ সবরকম অপরাধমূলক কাজই চালানো হতে থাকে। পুলিশ, প্রশাসন, রাজনৈতিক মদত সবটাই মুসলমানদের পক্ষে চলে যায়। সীমান্তের হিন্দু-মুসলমান মিশ্র গ্রামগুলি হিন্দুশূন্য হতে থাকে। আজ হোগলবেড়িয়া থানা যে বাড়িতে অবস্থিত তার মালিক এলাকার একজন প্রভাবশালী হিন্দু ছিলেন। ডাকাতরা তাকে খুন করে। তার স্ত্রী ও দুই সন্তান নিরাপত্তা না পেয়ে গ্রাম ত্যাগ করে করিমপুর শহরে গিয়ে আশ্রয় নেন। একতলা বড় পাকাবাড়ি হওয়ার কারণে সরকার ভাড়া নিয়ে হোগলবেড়িয়া থানার কাজ শুরু করে। এই হোগলবেড়িয়া গ্রাম ছিল একেবারেই হিন্দু-অধ্যুষিত। আজ হিন্দুর সংখ্যা দারুণভাবে হ্রাস পেয়েছে। বাম আর তৃণমূল আমালের মধ্যে পরিস্থিতির কোনো তফাত নেই। ১৯৭১ থেকে ২০০০ পর্যন্ত মাত্র ৩০ বছরেই ৩৫টি হিন্দু পরিবার হোগলবেড়িয়া ত্যাগ করে অন্যত্র চলে যেতে বাধ্য হয়। একটি ঘটনার কথা এখানে উল্লেখ করা হলো :

প্রফুল্লকুমার সরকার পিতা মৃত নগেন্দ্রনাথ সরকার, গ্রাম— তারাপুর, ডাকঘর— গোপালপুরহাট, থানা— হোগলবেড়িয়া। ২০০১ সালে তিনি পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বীজ নিগমের চেয়ারম্যান ছিলেন। তার পরিবার গ্রামের বাড়ি তারাপুরে থাকতেই আগ্রহী ছিল। হঠাৎ একরাত্রে স্থানীয় মুসলমানরা বাংলাদেশি দুষ্কৃতীদের সহায়তায় ডাকাতির অছিলায় তার মা এবং বোনেদের ধর্ষণ করে। ভয়ে এবং নিরাপত্তার কারণে দুষ্কৃতীদের নামে তিনি থানায় অভিযোগ পর্যন্ত জানাননি। তিনি এবং তার ছোটভাই মনোতোষ সরকার— যিনি করিমপুর পান্নাদেবী কলেজের করণিক ছিলেন, পরিবার-সহ গ্রাম ত্যাগ করে চলে যান। ফলে অনেক হিন্দু পরিবারই ধীরে ধীরে গ্রাম ছেড়ে অন্যত্র চলে যায়।

সীমান্ত অঞ্চল থেকে হিন্দুরা এইভাবে শুধু উৎখাতই হচ্ছে না, সীমান্তে জঙ্গিদের অবাধ চলাচল আরও সহজ হচ্ছে, গোরু পাচারের কালোটাকা রাজনীতিতে ব্যবহার বন্ধ হচ্ছে না ও জাতীয় নিরাপত্তায় দুর্বল জায়গাও তৈরি হচ্ছে। আমাদের রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় সরকার কি এ ব্যাপারে সজাগ?

(লেখক ডাইরেক্টর, সেন্টার ফর রিসার্চ ইন ইন্দো-বাংলাদেশ রিলেশনস্, কলকাতা)

With Best Compliments from -

A Well Wisher

১৫ই আগস্ট বিশেষ সংখ্যা

কার্গিল যুদ্ধে জয়ী ভারতীয় সেনাবাহিনী।

ভারতের সুরক্ষায় সামরিক বাহিনীর অবদান

মে: জে: কে কে গঙ্গোপাধ্যায় (অ:প্রা:)

কোনো রাষ্ট্রের শান্তি এবং উন্নয়ন অনেকটা নির্ভর করে তার প্রতিবেশী রাষ্ট্রের উপর। ভারত বিভাজন করে পাকিস্তানের জন্ম হলেও, জন্মলগ্ন থেকেই ভারতের বিরুদ্ধে আক্রমণ, সন্ত্রাসের কার্যকলাপ পাকিস্তান বিগত ৭০ বছর যাবৎ চালিয়ে যাচ্ছে। দাবি একটাই, যেভাবে হোক জম্মু-কাশ্মীর দখল করতে হবে। ভারতের আর এক প্রতিবেশী প্রবল শক্তিশালী চীন ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চল অধিকৃত তিব্বতের অংশ হিসেবে দাবি করে চলেছে। কিন্তু কোন অধিকারে তিব্বত দখল করে দলাইলামা-সহ বহু মানুষকে প্রাণ বাঁচাতে ভারতে পালিয়ে আসতে তারা বাধ্য করল, তার কোনো ব্যাখ্যা তাদের কাছে নেই। এই পরিবেশে রাষ্ট্রের সুরক্ষা ও সংহতি বাঁচিয়ে রাখতে ভারতের সামরিক বাহিনীকে একভাবে লড়াই করে যেতে হচ্ছে, ভারতের অন্য সুরক্ষা বাহিনীর কর্মীদেরও বলিদান দিতে হচ্ছে।

১৯৪৮ সালে পাকিস্তান জম্মুর পশ্চিমে পুঞ্চ এবং কাশ্মীরের রাওয়ালপিন্ডি-শ্রীনগর রোড ধরে জম্মু ও কাশ্মীর অধিকার করার জন্য সামরিক আক্রমণ আরম্ভ করে। ভারতীয় বাহিনীর কিছু সৈনিক বিমানে শ্রীনগর বিমান বন্দরে অবতরণ করে, বিমানবন্দর সুরক্ষিত করে ওই বন্দর দিয়ে সৈন্যবাহিনী পাঠাতে আরম্ভ করে। পাকিস্তানি বাহিনী পিছু হঠতে থাকে এবং উরি ও মারের মধ্যবর্তী পাহাড়গুলিতে আশ্রয় নেয়। ভারতীয় সামরিক বাহিনীকে থামাতে ঝিলম নদীর উভয় তীরে তারা দুর্গম সুউচ্চ পাহাড় চূড়ায় বাঙ্কার করে মাইন পুঁতে বাধা দিতে থাকে। তখন শীতকাল এসে গিয়েছে, পাহাড়গুলি বরফে ঢেকে গিয়ে আরও দুর্গম হয়ে উঠেছে। জম্মু-কাশ্মীরে যুদ্ধ হচ্ছে আর ভারতের গভর্নর জেনারেল মাউন্ট ব্যাটেন ও পাকিস্তানের ব্রিটিশ গভর্নর জেনারেল টেলিফোনে কথোপকথন করে চলেছেন। পাক গভর্নর জেনারেল মাউন্ট ব্যাটেনকে অনুরোধ করেন যেভাবেই হোক যুদ্ধ বন্ধ করতে হবে, অন্যথায় ভারতীয় সেনাবাহিনীকে আটকানো যাবে না। জওহরলাল নেহরুকে মাউন্ট ব্যাটেন বোঝালেন যুদ্ধে শুধু শুধু সৈন্যক্ষয় না করে এক তরফা ভাবে যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করে রাষ্ট্রসঙ্ঘের দ্বারস্থ হলে জম্মু-কাশ্মীর ভারতেরই থাকবে। কারণ শর্ত অনুযায়ী মহারাজা ভারত রাষ্ট্রে যোগদান করেছেন, ব্রিটিশ সরকারও তার সাক্ষী। পণ্ডিত নেহরু সেই কাজই করলেন। কিন্তু কাশ্মীরের এক বিরাট অংশ আজও পাকিস্তানের অধিকারে। আজও পাকিস্তান সমগ্র জম্মু-কাশ্মীর কুক্ষিগত করার জন্য ছায়াযুদ্ধ চালিয়ে, সন্ত্রাস ও জঙ্গি অনুপ্রবেশ করিয়ে কাশ্মীরে মানুষের জীবন দুর্বিষহ করে রেখেছে। ভারতীয় সামরিক বাহিনী অতন্দ্র প্রহরীর মতো এই সন্ত্রাস ও অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে।

১৯৬৫ সালে পাকিস্তান আবার পরিকল্পনা করেছিল, জম্মুর পশ্চিমে 'আখনুর-সেতু' (আকনুর ব্রিজ) দখল করে পাঠানকোট জম্মু সড়ক অধিকার করে নেবে এবং জম্মু-কাশ্মীর রাজ্যকে ভারত থেকে আলাদা (আইসোলেট) করে দেবে। একই সঙ্গে জম্মু ও কাশ্মীরে সামরিক বাহিনী পাঠিয়ে সমগ্র রাজ্যটি অধিকার করে নেবে। পরিকল্পনামতো আখনুর ব্রিজের দিকে পাক সাঁজোয়া বাহিনীর ছয় নম্বর ডিভিশন এবং প্রচুর পদাতিক ও অন্যবাহিনী আক্রমণ শুরু করে। জম্মু-কাশ্মীর সীমান্তের বিভিন্ন জায়গায় তারা সৈন্য বাহিনী প্রস্তুত করে রাখে।

ভারতের সামরিক বাহিনী বুঝতে পারে পাক সাঁজোয়া বাহিনীকে থামাতে পাকিস্তানের অন্যত্র আক্রমণ চালাতে হবে, অন্যথায় জম্মু-কাশ্মীর রক্ষা করা কঠিন হয়ে যাবে। ভারতীয় সামরিক বাহিনীর প্রথম সাঁজোয়া ডিভিশন সেই সময় পঞ্জাবে অবস্থান করছিল। আদেশ পাওয়া মাত্র সাম্বা-রামগড় অঞ্চলে সিয়ালকোট অভিমুখে আক্রমণ আরম্ভ করল। সাঁজোয়া বাহিনী সিয়ালকোট শহরের দক্ষিণে 'ফিলোরা চৌরাস্তা' আক্রমণ করে অধিকার করে নেয়। ভারতীয় সামরিক বাহিনী এই আক্রমণে অভূতপূর্ব সাহসিকতা এবং আত্মত্যাগের নিদর্শন রেখে যায়। প্রায় ২২দিন যুদ্ধের পর ১৯৬৫-র ২৩ সেপ্টেম্বর যুদ্ধ-বিরতি হয় এবং তাসখন্দে যুদ্ধবিরতি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। কিন্তু অনুতাপের বিষয়, স্বাক্ষর করার পরই তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রী হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ভারত অধিকৃত প্রায় ৫১৮ বর্গ কিলোমিটার অঞ্চল পাকিস্তানকে ফিরিয়ে দেয়। রাজস্থান ও কাশ্মীরে সামান্য অধিকৃত অঞ্চলও পাকিস্তানকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। কাশ্মীরে বিখ্যাত পাহাড়ে পাকঘাঁটি ও উরি-পুঞ্চ সংযোগকারী কাঁচা রাস্তায় যাওয়ার গুরুত্বপূর্ণ গিরিপথ পাকিস্তানকে ফিরিয়ে দেওয়া হয় যা ভারতীয় সৈন্যরা অধিকার করেছিল।

পূর্ববাংলা পূর্ব পাকিস্তান হওয়ার পর থেকেই পাকিস্তান সরকার

পূর্ব পাকিস্তানকে তাদের কলোনি অথবা উপনিবেশ হিসেবে ব্যবহার করছিল। পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর সামরিক বাহিনীর সহায়তায় বাংলা ভাষাভাষী নাগরিকদের উপর জঘন্য বর্বরোচিত ব্যবহার করে তাদের জীবন, সমাজ, ভাষা সর্বস্তরে প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করেছিল। পাক সামরিক বাহিনীর অত্যাচারে হাজার হাজার বাঙালি পূর্ব পাকিস্তান থেকে ভারতে শুধুমাত্র প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে শরণার্থী হয়ে চলে আসতে বাধ্য হয়েছিল। সামরিক বাহিনীর দমন পীড়ন চরমতম আকার ধারণ করলে পূর্ববঙ্গের লক্ষ লক্ষ বাঙালি ভারতে এসে আশ্রয় নিয়েছিলেন। ভারতের অর্থনীতি ও সমাজ ব্যবস্থা এই প্রচণ্ড চাপে ভেঙে পড়ার পর্যায়ে চলে এসেছিল। ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী সমস্ত বিশ্ব পরিভ্রমণ করে সমস্ত রাষ্ট্রকে অনুরোধ করলেন পাকিস্তান সরকারকে বুঝিয়ে এই দমন পীড়ন বন্ধ করতে যাতে এই শরণার্থীরা দেশে ফিরে যেতে পারেন। কিন্তু ছোট বড় কোনো রাষ্ট্র অথবা রাষ্ট্রসঙ্ঘ কোনো পদক্ষেপই নিল না। কারণ সেটি নাকি পাকিস্তান রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ সমস্যা।

ভারতের প্রধানমন্ত্রী তখন সামরিক অধ্যক্ষ জেনারেল মানেক'শকে নির্দেশ দিলেন, এমন ব্যবস্থা গ্রহণ করুন যাতে এই বহু লক্ষ শরণার্থী নিরাপদে ঘরে ফিরে যেতে পারেন এবং নিরাপত্তার সঙ্গে সেখানে জীবনযাপন করতে সক্ষম হন। ভারতের সামরিক অধ্যক্ষ সামরিক প্রস্তুতি গ্রহণ করলেন, কিন্তু পূর্ববঙ্গে হস্তক্ষেপ করলেন না। অবশেষে এল ৩ ডিসেম্বর ১৯৭১, যেদিন পাকিস্তান ভারতের পশ্চিম সীমান্তে বিভিন্ন সামরিক বিমান বন্দরে বিমান হানা দিল এবং তাদের সামরিক বাহিনী ভারতের পশ্চিম সীমান্তে পঞ্জাবের উত্তরে ভারত আক্রমণ করল। এই যুদ্ধে তারা বিশেষ সুবিধা করতে পারেনি, ভারতের প্রতিরোধের ধাক্কায় তারা সমাধি লাভ করল।

মাত্র ২১ দিনের মধ্যেই ঢাকা অধিকার করা সম্ভব হলো। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সেভেন্থ ফ্লিট পাকিস্তানের সমর্থনে বঙ্গোপসাগরে প্রবেশ করেছিল। কিন্তু তার কোনো ভূমিকা নজরে আসেনি। পূর্ব পাকিস্তানের সেনাধ্যক্ষ ভারতে পূর্ব কম্যান্ডের সেনাধ্যক্ষের কাছে আত্মসমর্পণ করলেন। প্রায় এক লক্ষ তিরানব্বই হাজার সৈনিক যুদ্ধবন্দি হয়েছিল। ভারত-পাকিস্তানের দুই প্রধানমন্ত্রী সিমলা চুক্তি স্বাক্ষর করলেন। যুদ্ধবন্দিরা সসম্মানে পাকিস্তানে ফিরে গেলেন। পূর্ব পাকিস্তান স্বাধীন বাংলাদেশ হয়ে আত্মপ্রকাশ করল।

১৯৯৯-এ কার্গিল সীমান্ত যুদ্ধ ভারত-পাক প্রত্যক্ষ সংগ্রামের এখনও পর্যন্ত শেষ সম্মুখ সমর। প্রতি বছর শীতকালে কার্গিল সীমান্ত থেকে ভারতীয় সৈনিকরা নীচে নেমে আসতো। তাদের বিশ্বাস ছিল যুদ্ধ বিরতি রেখা এবং 'এল ও সি' চুক্তি ভঙ্গ করে পাকিস্তানের সামরিক বাহিনী বিশ্বাসঘাতকতা কখনই করবে না। কিন্তু পাকিস্তানের তৎকালীন সামরিক অধ্যক্ষ জেনারেল মোশারফ চুক্তিভঙ্গ করে ভারতের সমস্ত প্রতিরক্ষা বাঙ্কার-সহ সু-উচ্চ টাইগার হিলও দখল করে নিল।

ভারতীয় সৈনিকরা আক্রমণ করল এবং একদিকে বোর্ফস কামান, অন্যদিকে বিমান আক্রমণ সঙ্গে নিয়ে পরম সাহসিকতার সঙ্গে পদাতিক বাহিনী সমস্ত কার্গিল অঞ্চল পাক-সৈন্যদের হাত থেকে ছিনিয়ে নিল।

এরপর থেকে পাকিস্তান ভারতের বিরুদ্ধে কট্টরপন্থী লস্কর-ই-তৈবা সন্ত্রাসবাদীদের ব্যবহার করে ছায়াযুদ্ধ আরম্ভ করল। মুম্বই, পঞ্জাব পাঠানকোট, উরি, বারামুল্লা, অনন্তনাগ আরও কত ভূখণ্ডে সন্ত্রাসবাদী আক্রমণ আজও চালিয়ে যাচ্ছে। তার সঙ্গে সন্ত্রাসবাদীদের অনুপ্রবেশ করাতে যুদ্ধবিরতি ভঙ্গ করে প্রতিদিন জম্মু-কাশ্মীর পঞ্জাব সীমান্তে গোলাগুলি বর্ষণ করে চলেছে। অমরনাথ যাত্রীদের উপর হামলা করে অনেককে নিহত করছে। এই যুদ্ধ চলবে। সমগ্র বিশ্ব এর প্রতিবাদ করলেও চীন সমর্থন করছে।

চীন ১৯৬২ সালে দাবি করা অঞ্চল অধিকার করার জন্য 'ধোলা' পোস্ট আক্রমণ করে অধিকার করে এবং চীনা সৈন্য 'বমডিলা' পর্যন্ত পৌঁছে যায়। অন্যদিকে লাদাখে 'দৌলত বেগ অল্ডি' অঞ্চল আক্রমণ করে অধিকার করে নেয়। ভারত এই আক্রমণের জন্য প্রস্তুত ছিল না। শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানই ছিল ভারতের নীতি। সেইজন্য ভারত নিজেদের সামরিক শক্তি বাড়ানোর কোনো প্রয়াসই করেনি। যে শক্তি ছিল তাতে পাক সামরিক বাহিনীকে প্রতিহত করা যেত, কিন্তু চীনকে নয়। চীনের বিরুদ্ধে ভারত বিমানবাহিনী পর্যন্ত ব্যবহার করেনি, সীমান্তেও তেমন ভাবে সৈন্য সমাবেশ করেনি। বহু সৈন্য হতাহত হয়। চীনের সু-চিন্তার উদয় হয় এবং অধিকৃত ভূখণ্ড থেকে তিব্বতে ফিরে যায়। এর পর থেকে মাঝে মাঝেই অস্ত্রবিরতি রেখা পার করে ভারতের লাদাখ ও অরুণাচল প্রদেশ তারা বহুবার অনুপ্রবেশ করে শক্তির জাহির করেছে।

১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দে সিকিমে নাথলা গিরিপথের পশ্চিমে ইয়াকলা-চোলা আক্রমণ করে বাঙ্কার-হোলিপ্যাড ভেঙে গুঁড়িয়ে তারা ফিরে যায়। শান্তিচুক্তি হয় এবং লাইন অফ কন্ট্রোল রেখা স্থির করা হয়। কিন্তু সেই রেখাও প্রায়শ তারা ভঙ্গ করছে। তারা সিকিম ও ভুটানেও কিছু কিছু অঞ্চল নিজের ভূখণ্ড বলে দাবি করেছে।

সম্প্রতি চুম্বি ভ্যালীতে 'জলঢাকা' প্রকল্পের কিছু উত্তরে ভুটানের 'ডোকালা' অঞ্চল-চীনের ভূখণ্ড বলে দাবি করে সেখানে রাস্তা নির্মাণ শুরু করে। ভারতের কয়েকটি বাঙ্কার গুঁড়িয়ে দেয়। ভারত রাস্তা নির্মাণ রুখতে কিছু সৈনিক পাঠায়। চীন হুমকি দিচ্ছে 'ভুটানের হয়ে তোমরা প্রতিরোধ করার কে?' ১৯৬২-কে ভুলে যেও না। ভারত ভোলেনি, তাই সৈন্যরা এখনও দাঁড়িয়ে রয়েছে। মাত্র একটিই উপায়— ভারতকে নিজ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা এত শক্তিশালী করতে হবে যাতে কোনো দেশ বিশেষ করে চীন ও পাকিস্তান ভারতের উপর লোভাতুর দৃষ্টি দেওয়ার সাহস না পায়।

১৫ই আগস্ট
বিশেষ সংখ্যা

রামজন্মভূমি আন্দোলন : অস্মিতা রক্ষার সংগ্রাম

ডাঃ শচীন্দ্রনাথ সিংহ

যদি দেশের ভূমিখণ্ড কেউ ছিনিয়ে নেয় তাকে শৌর্যের দ্বারা আবার ফিরিয়ে আনা যায়। যদি ধনসম্পত্তি নষ্ট হয়ে যায় তাহলে পরিশ্রম করে তা উপার্জন করা যায়। যদি রাজসত্তা কেউ জোর করে কেড়ে নেয় তাহলে পরাক্রম দ্বারা আবার ফিরিয়ে আনা যায়। যদি রাষ্ট্রীয় চেতনা সমাপ্ত হয়ে যায়, রাষ্ট্রীয় গৌরব লুপ্ত হয়ে যায় তাহলে শৌর্য, পরিশ্রম, পরাক্রম তাকে ফিরিয়ে আনতে পারে না। সেই জন্য ভারতীয় বীর-সন্তানরা ভীষণ বিষম পরিস্থিতিতেও, হাজার অসুবিধার মধ্যে রাষ্ট্রীয় এই অস্মিতা রক্ষার জন্য চেষ্টা করে এসেছিলেন। গো-গীতা-গঙ্গা-গায়ত্রী-মঠ মন্দির, সাধু-সন্ত, দেবী-দেবতা হলো ভারতীয় অস্মিতার প্রতীক। এখানে জন্মগ্রহণ করে অনেক অবতার ও মহাপুরুষ কেবলমাত্র এই দেশ ও দেশবাসীকেই গর্বিত করেননি, নিজে ধন্য হয়েছেন। এমনই একজন মহামানব ছিলেন মর্যাদা পুরুষোত্তম শ্রীরাম।

যা কেবল আস্থা ও শ্রদ্ধার বিষয় ছিল তাকে আইনি লড়াইয়ের মধ্যে টেনে আনা হলো। যা কখনও কোনো দেশে হয়নি— না ইজরাইল, না জর্ডন, না স্পেন— যেখানে আস্থা নিয়ে সংঘর্ষ প্রথম থেকেই ছিল। আজও চলছে। সেখানে তো কোনো কোর্ট-কাছারি হয়নি। আমাদের দেশের নেতৃত্ব কেন বার বার কোর্টের দোহাই দিচ্ছেন? অযোধ্যায় শ্রীরাম জন্মভূমি কোটি কোটি হিন্দুর আস্থা ও শ্রদ্ধার সঙ্গে যুক্ত— অন্য কোনো সম্প্রদায়ের নয়। অতএব সব সময় তাকে সম্মান দেওয়ার আবশ্যকতা ছিল, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত মধ্যযুগে এক সাম্প্রদায়িক অসহিষ্ণুতা তার উপর নির্মম আঘাত হানল। হাজার বছরের, কোটি কোটি মানুষের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের উপর এক কলঙ্ক চিহ্ন এঁকে দিল। বাবরের সেনাপতি মিরবাকি অযোধ্যার মন্দির ভেঙে এক মসজিদের ধাঁচা নির্মাণ করে দিল। এক হাতে কোরান আর এক হাতে তলোয়ার নিয়ে ইসলামিক সাম্রাজ্যবাদের বিস্তার হতে লাগল। মন্দির ভেঙে মসজিদ হতে থাকল। ধর্মভিত্তিক দ্বি-জাতিতত্ত্বের জন্ম নিল। ঘৃণা থেকে প্রতিশোধের বীজ জন্মায়। শ্রীরাম জন্মভূমির ইতিহাস এইরূপ আস্থা- বিশ্বাস এবং প্রতিশোধের এক দীর্ঘ কাহিনি।

১৫২৮ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত বাবরি ধাঁচার পূর্বে ওই স্থানে মন্দির ছিল তা আজ প্রমাণিত হয়েছে। আদালতের আদেশে কানাডার একটি বিশেষজ্ঞ দল র‍্যাডার পর্যবেক্ষণ এবং পরে মাটি কেটে উৎখননে প্রাচীন মন্দিরের নিদর্শন প্রমাণ করে ওই

স্থানটি শ্রীরামজন্মস্থান। ১৫২৮ সাল থেকে ১৯৪৯ পর্যন্ত মন্দির পুনর্নির্মাণের জন্য ৭৬ বার যুদ্ধের ঘটনা ইতিহাসে উল্লেখ পাওয়া যায়। রাজা থেকে সন্ন্যাসী, সাধারণ মানুষ এই যুদ্ধগুলিতে যোগ দিয়েছিলেন। ১৯৩৪ সালে অযোধ্যার বৈরাগীদের দ্বারা শেষ বড় সংঘর্ষের পর আর কখনও ওই স্থানে নমাজ পড়া হয়নি। ১৮৫৭ সালের স্বাধীনতা সংগ্রামের পর আমির আলির নেতৃত্বে অযোধ্যার স্থানীয় মুসলমান সমাজ ওই স্থানটি হিন্দুদের ছেড়ে দিতে রাজি হয়। বাবা রাঘবদাস হিন্দুদের প্রতিনিধি হয়ে মুসলমানদের সঙ্গে কথা বলেন। কিন্তু চতুর ইংরেজ হিন্দু-মুসলমানের এই বিবাদ স্থায়ী করার চক্রান্তে ওই দু'জনকে ফাঁসিকাঠে চড়ায়। সমস্যা সমাধানের চেষ্টা এখানেই থেমে যায়। ১৯৪৯ সালের ২৩ ডিসেম্বর থেকে রামভক্তরা ওই সৌধের মধ্যে

শ্রীরামচন্দ্রের পূজা অর্চনা শুরু করে দেয়। সরকারি বাধাবিপত্তি সত্ত্বেও নিত্য পূজা আরতি চলে। সরকারি সুরক্ষার মাধ্যমে তালাবন্ধ অবস্থার রামলালার দর্শন ও পূজা চলতে থাকে। ১৯৮৪ সালের অক্টোবর মাসে 'শ্রীরাম জানকী রথ' যাত্রার মাধ্যমে জনজাগরণ আরম্ভ হয়। জনতার দাবিতে ১৯৮৬ সালের ১ ফেব্রুয়ারি তালা খুলে দেওয়া হয়। ১৯৯০ সালে করসেবা এবং '৯২-এ ২ লক্ষ করসেবকের আক্রোশে পুরাতন ধাঁচা ধুলিসাৎ হয়। পরবর্তী ঘটনা কমবেশি সকলের জানা। ২৫ বছর ধরে ভগবান রামলালা অযোধ্যায় কাপড়ের তাঁবুতে বিরাজমান রয়েছেন।

স্বাধীনতার ৭০ দশক পরেও হিন্দু অস্মিতা মেকি ধর্মনিরপেক্ষতার ফাঁস থেকে বেরিয়ে আসতে পারেনি। সংখ্যাগুরু ও সংখ্যালঘু রাজনীতির বিষবাষ্পে জর্জরিত। রামমন্দির নির্মাণের ধাঁচা হিন্দু জাতীয়তাবোধের উপর সরাসরি প্রহার। দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে দেশখণ্ডিত হওয়ার পর পাশাপাশি দুটি ধর্মীয় রাষ্ট্রের জন্ম নিল কিন্তু ভারত এখনও ধর্মীয় স্বাধীনতা পেল না। শুধু রাজনৈতিক স্বাধীনতা আমরা কেবল লাভ করেছি। অযোধ্যায় শ্রীরাম মন্দির নির্মাণ কেবল একটা মন্দির নির্মাণ নয়— ধর্মীয় স্বাধীনতা আন্দোলন। স্বাধীন ভারতবর্ষে 'জয় শ্রীরাম' ধ্বনি নতুন স্বাধীনতা আন্দোলনের বীজমন্ত্র। ভগবান শ্রীরামচন্দ্র রাষ্ট্রীয় অস্মিতার প্রতীক। তবু কেন— কী কারণে অযোধ্যায় ভব্য রামমন্দির নির্মাণ হচ্ছে না— বাধা কোথায়? ভারতবর্ষের নাগরিক অর্থাৎ ভোটার লিস্ট, রেশনকার্ড, আধার কার্ডে যাদের নাম আছে তারা কি সকলেই ভারতীয়? ভারতবর্ষের নাগরিক হওয়ার জন্য এইটুকুই প্রমাণ পত্র হলে যথেষ্ট কি? দেশের প্রতি আনুগত্য, পরম্পরার প্রতি শ্রদ্ধা, মহাপুরুষ, দেব-দেবী, ধর্মগ্রন্থ, সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধা আস্থা ও বিশ্বাসের কোনো প্রয়োজন আছে কিনা? উপাসনার দিক থেকে আলাদা হলেও রাষ্ট্রীয়তার দিক থেকে সমস্ত ভারতবাসীকে এক হতে হবে। প্রতীকী দিক থেকে রামমন্দিরের আন্দোলনের এটাই পটভূমি।

আজ ভারতে বসবাসকারী মুসলমানদের একাংশ মধ্যযুগীয় জেহাদি নরঘাতকদের আদর্শ করে জেহাদের পথে চলেছে ও ভারতকে শত্রুরাষ্ট্র ভাবতে শিখেছে। এই পরিণামের পিছনে রামবিরোধীদের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। এজন্য রামন্দির নির্মাণে কেবল জাতীয় সংহতির সুদৃঢ়ীকরণই হবে না, সেই সঙ্গে জেহাদি মানসিকতারও মূলে আঘাত হানা হবে।

বর্তমান কেন্দ্র সরকার রামভক্তদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তাদের নির্বাচনী ইস্তাহারে রামমন্দির নির্মাণের বাধাগুলি দূর করার জন্য তারা সচেষ্ট হবেন। ২০১৯ সালে আবার লোকসভা নির্বাচন। মাঝখানে উত্তরপ্রদেশে যোগী আদিত্যনাথের নেতৃত্বে ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার চলছে। আগামী নভেম্বর মাসে কর্ণাটকের উডুপিতে ২৪-২৫-২৬ ধর্মসংসদ অনুষ্ঠিত হচ্ছে। বিশ্ব হিন্দু পরিষদ এবং সারাদেশের প্রধান সন্তরা একত্রিত হচ্ছেন।

অযোধ্যায় রামমন্দির নির্মাণের পাথর কাটা এবং নকশাকরার কাজ ৮৫ ভাগ হয়েছে। সোমনাথমন্দির যে ভাবে আইন করে তৈরি হয়েছিল, রামমন্দির নির্মাণ সেইভাবে পার্লামেন্টের উভয় কক্ষের যৌথ অধিবেশন করে হোক— সমস্ত রামভক্তের এই প্রত্যাশা। ধর্মসংসদের সিদ্ধান্তের জন্য দেশ অপেক্ষা করছে। মোদী ও যোগীর নেতৃত্বাধীন সরকারই পারে রামমন্দির নির্মাণের সব বাধা দূর করতে। ভগবান রামলালা আর কতকাল তাবুর তলায় থাকবেন! আসুন, আমরা সবাই শ্রীরামজন্মভূমিতে মন্দির নির্মাণের জন্য সংকল্পবদ্ধ হই।

(লেখক বিশ্ব হিন্দু পরিষদের ক্ষেত্রীয় সংগঠক)

১৫ই আগস্ট বিশেষ সংখ্যা

স্বাধীনতার সাত দশক

এক দেশ, এক আইনের পথে ভারত

অর্ণব ব্যানার্জী

ভারত স্বাধীন হবার পর দেশে বহু আইন ব্যবস্থা চালু হলো। ইংরেজরা নিজেদের স্বার্থে দেশে বহু সিভিল কোড চালু রেখেছিল। স্বাধীন ভারতে সরকার সেই একই ব্যবস্থা চালু রেখে ইংরেজদের পদাঙ্ক অনুসরণ করলো। নেহরু ভীষণভাবে ইংরেজ অনুসারী ছিলেন। বহু ধরনের আইন ব্যবস্থার ফলে দেশবাসী সমান আইনি অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছে যেমন, তেমনি কিছু শ্রেণীর মনে অতিরিক্ত অধিকারবোধের সৃষ্টি হয়েছে, যা কখনও কাম্য ছিল না।

এক দেশ, দুই সংবিধান

সারা ভারতে ভারতীয় সংবিধান পুরোপুরি চালু আছে কিন্তু অঙ্গরাজ্য কাশ্মীরে নেই। সেখানে ৩৭০ ধারা অনুযায়ী আংশিক চালু আছে। ভারতের যাবতীয় আইন কাশ্মীর বাদে সারা ভারতে চলে। এর ফলে কাশ্মীরে বসবাসকারীরা ভারতীয় দণ্ডবিধির আওতার বাইরে থাকে। ভারতীয় হিন্দুরা কাশ্মীরে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে পারেন না। এর ফলও ফলেছে খুবই মারাত্মক।

কাশ্মীর থেকে হাজারে হাজারে লাখে লাখে হিন্দু পণ্ডিত পালিয়ে এসেছে সর্বহারা হয়ে। তাদের সম্পত্তি লুটপাট হয়েছে। কাশ্মীরে সর্বক্ষণের জন্য সেনা মোতায়েন করে রাখতে গিয়ে ভারতের বিপুল অর্থব্যয় হচ্ছে। কাশ্মীরের বিশাল মুসলমান সম্প্রদায় ৩৭০-এর সমর্থনে লম্বা মিছিল বার করছে। তারা ৩৭০ ধারা বহাল রাখতে চায়। কারণ তারা কাশ্মীরের মুসলমান প্রধান জনবিন্যাসে বদল চায় না। আর জম্মুর হিন্দুরা পুরো সাংবিধানিক আইন চায়। এই নিয়ে বিরোধ বাঁধছে। এখন মোদী সরকার ৩৭০ ধারা তুলে দিয়ে এক সংবিধান এক দেশ করতে ভাবনাচিন্তা করছে।

এক দেশ, দুই পার্সোনাল ল'

ভারতে হিন্দু কোড বিল আছে হিন্দুদের পার্সোনাল ল' হিসেবে আর শরিয়া আছে মুসলমানদের পার্সোনাল ল' হিসেবে। খ্রিস্টানদের আর শিখদের আলাদা আলাদা পার্সোনাল ল। এর ফলে বাড়ছে নানা সমস্যা। যেমন—

(ক) অসম জনভারসাম্য :

হিন্দু পুরুষ এক নারী গ্রহণ করে। মুসলমান পুরুষ বহুবিবাহ করে। এর কুপ্রভাব জনসংখ্যার অসম ভারসাম্যে দেখা যায়। মুসলমানদের সংখ্যা বাড়ে আর হিন্দুদের সংখ্যা কমে। যে-কোনো জনগণনায় দেখা যাচ্ছে মুসলমান জনসংখ্যা হু হু করে বেড়ে যাচ্ছে। কিছু কিছু রাজ্যে তো মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়ে উঠেছে।

(খ) তিন তালাক :

এছাড়া বিবাহবিচ্ছেদ প্রক্রিয়াতেও অনেক পার্থক্য। হিন্দুদের যেমন আইনি প্রক্রিয়ায় বিচ্ছেদ হয় তাতে নারীদের অধিকার সুরক্ষিত থাকে। মুসলমানদের শুধু তিনবার তালাক বললেই বিচ্ছেদ হয় আর তাতে সম্পত্তির অধিকার সুরক্ষিত থাকে না। তারা খোরপোশ পায় না। শাহবানু মামলায় এটা দেখা গেছে। সম্প্রতি মুসলমান মেয়েরা তিন তালাক প্রথা তুলে দেবার জন্য আন্দোলন শুরু করেছেন।

(গ) সম্মান রক্ষার্থে হত্যা বা অনার কিলিং :

এটাও মুসলমানদের আমদানি। মুসলিম আইনে এটাও বৈধ। হিন্দু পুরুষ মুসলমান মেয়েকে বিয়ে করলে সম্প্রদায়ের সম্মান রক্ষার্থে তাকে হত্যা করা হয়। একেই বলে অনার কিলিং।

(ঘ) লাভ জিহাদ :

এর দ্বারা মুসলমান যুবকেরা হিন্দু মেয়েদের প্রেমের জালে ফাঁসিয়ে বিয়ে করে ধর্ম পরিবর্তন করায়। এটাও মুসলমান আইন অনুযায়ী আইনসম্মত।

(ঙ) স্ত্রী-নিগ্রহ :

মুসলমান আইনে স্ত্রীকে চাবুক মারা আইনসম্মত। সৌদির ধর্মগুরুরা মাঝে মধ্যেই কীভাবে বউ পেটানো হবে তার নিদান দিয়ে থাকে। হিন্দু আইনে স্ত্রী-নিগ্রহ নিষিদ্ধ। এর ফলে এক শ্রেণীর মেয়েরা নির্যাতিত হয়ে থাকে।

(চ) অজাচার :

মুসলমান আইনে অজাচার বা ভাই-বোনের বিবাহ বা শ্বশুর-পুত্রবধুর বিবাহ আইনসম্মত। কিন্তু হিন্দু আইনে নয়। এই অজাচার থেকে জিনগত ত্রুটি যুক্ত শিশু জন্মায়। ফলে আগামী প্রজন্ম ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

এক দেশে বহু আইনের ফলে দেশবাসীর ভোগান্তি বন্ধ করতে বর্তমান সরকার এক দেশ এক আইন চালু করতে যাচ্ছেন। এতে করে দেশের সমস্ত নাগরিক সমান আইনি সুবিধা ভোগ করবেন আক্ষরিক অর্থেই। ৩৭০ ধারা বাতিল করতে চায় বর্তমান সরকার। এতে কাশ্মীরিরাও ভারতের আইনি সুবিধা পাবেন। সকল অন্যায় আর বৈষম্যের অন্ত হবে।

১৫ই আগস্ট
বিশেষ সংখ্যা

স্বাধীনতার ৭০ বছর পরে উন্নয়নের রথ চলছে উত্তর-পূর্ব ভারতে

ধর্মানন্দ দেব

আমাদের স্বাধীনতা পাওয়ার সত্তর বছর পেরিয়ে গেল। স্বাধীন ভারতে এই প্রথম কোনও অ-কংগ্রেসি রাজনৈতিক দল একা হাতে দিল্লির দরবারে সরকার গঠনের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়। মোদীর বিজেপি এমন অনন্য কৃতিত্ব হাসিল করল যা বাজপেয়ীর বিজেপি পারেনি। ১৯৭৭ সালে অবশ্যই জনতা পার্টি একক অ-কংগ্রেসি রাজনৈতিক দল হিসাবে ৩০২টা লোকসভার আসন জিতে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছিল। বাজপেয়ীর বিজেপি ও মোদীর বিজেপি'র মতো অভিন্ন চরিত্রের একক রাজনৈতিক দল বা সম্পূর্ণ অ-কংগ্রেসি সংগঠন কখনওই ছিল না ১৯৭৭-এর জনতা পার্টি। তাই জনতা পার্টিকে খাটো না করেই বলা যায় প্রথম অ-কংগ্রেসি নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ রাজনৈতিক দল হিসেবে মোদীর নেতৃত্বে বিজেপি কেন্দ্রে সরকার গঠন করে। ২০১৭ সালের ২৬ মে মোদী সরকার ক্ষমতায় আসার তিন বছর পূর্ণ করল। এই তিন বছরেই মোদী সরকার উন্নয়নের পথে নিয়ে যায় ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সিকিম, অসম, অরুণাচল প্রদেশ, মেঘালয়, মণিপুর, নাগাল্যান্ড, মিজোরাম এবং ত্রিপুরা রাজ্যকে। ফলস্বরূপ ২০১৬ সালের ১৯ মে বিজেপির বিজয়রথ সগর্বে অসমে প্রবেশ করে। এই প্রথম উত্তরপূর্ব ভারতের কোনও রাজ্যে সরকার গঠন করে ভারতীয় জনতা পার্টি। জনতার রায়ে অসমে একেবারে গন্ধমূষিকে পরিণত হয়েছে কংগ্রেস এবং বর্তমানে তাদের সংগ্রামের সাথী সিপিএম। এই কংগ্রেসের সঙ্গেই উদ্বাহু আলিঙ্গন করতে গিয়ে সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে তাদেরই বাহুপাশে দমবন্ধ হয়ে মৃত্যু ঘটেছিল সিপিএমের। তারপর উত্তর-পূর্ব ভারতের অরুণাচল প্রদেশ ও মণিপুর রাজ্যেও বিজেপি জোট সরকার গঠন করে। সম্প্রতি তিন বছর পূর্তি উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির খাদ্য ও কৃষি ক্ষেত্রে উন্নয়নের জন্য ৬০০০ কোটি টাকার 'সম্পদা' নামে এক প্রকল্প চালু করেন। মহাবাহু ব্রহ্মপুত্রের বুকে দেশের সর্ববৃহৎ সেতুর উদ্বোধন করেন নরেন্দ্র মোদী। ধলা থেকে সদিয়াগামী ৯.১৫ কিলোমিটার দীর্ঘ সেতুটির নামকরণ করেছেন কিংবদন্তী সঙ্গীত শিল্পী অসম-সন্তান ড. ভূপেন হাজারিকার নামে। উল্লেখ, এই সেতুটি অষ্টলক্ষ্মীর আর্থিক বিকাশে সাহায্য করবে যেমন তেমনি অরুণাচল প্রদেশের ভারত-চীন সীমান্তে চীনা ফৌজের আগ্রাসন রোধেও এটি কার্যকরী ভূমিকা নেবে। ৬০ টন ওজনের যুদ্ধট্যাঙ্ক বহনে সক্ষম সেতু সহজেই ভারতীয় সেনাকে দেশের পূর্বপ্রান্তে পৌঁছে দেবে। সত্যি, সমৃদ্ধ ভারত নির্মাণের জন্য উত্তর-পূর্বাঞ্চলকে বর্তমান সরকার এক নতুন ইঞ্জিন হিসেবে তৈরি করছে। তার জন্য পঞ্চপথকে বর্তমান কেন্দ্র সরকার বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করছে। ওই পথগুলি হচ্ছে— রেলপথ, জলপথ, বিমানপথ, রাজপথ এবং ইনফরমেশন পথ। সমগ্র উত্তর-পূর্ব ভারতের পরিবর্তন সাধনের জন্য অসমের গোগামুখে কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হয়। উল্লেখ্য, গত তিন বছরে দেশে ভূমি পরীক্ষাগারের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ৯ হাজার যা আগে গোটা দেশে ছিল মাত্র ১৫টি। মাত্র তিন বছরের মধ্যে অসম রাজ্যে একটি 'এইমস' স্থাপনের জন্য ইতিমধ্যে শিলান্যাস হয়েছে। কিন্তু ওই অসমে বিগত কংগ্রেস আমলে ১৬ হাজার কোটি টাকার ঋণ ছিল। উত্তর-পূর্ব ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে অটল অমৃত যোজনা চালু হওয়ায় হাজার হাজার সুবিধাভোগীরা প্রায় ২ লক্ষ টাকা করে সাহায্য

পেয়েছেন। মোদী সরকার কেন্দ্রে ক্ষমতায় আসার সঙ্গে সঙ্গে দু'টি নোটিফিকেশন' জারি করে— '৩১ ডিসেম্বর ২০১৪ সাল পর্যন্ত ধর্মীয় নির্যাতনের শিকার হয়ে হিন্দু, জৈন, খ্রিস্টান, বৌদ্ধ, পার্সি এবং শিখ ধর্মাবলম্বী মানুষ অর্থাৎ বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের সংখ্যালঘু মানুষ নিজ দেশ থেকে বিতাড়িত হয়ে ভারতে প্রবেশ করছেন তাদের ক্ষেত্রে পাসপোর্ট (ভারতে প্রবেশ) আইন ১৯২০ এবং ১৯৪৬ সালের বিদেশি আইন প্রযোজ্য হবে না। মানবিক কারণেই তাদের ভারতে থাকতে দেওয়া হবে প্রয়োজনীয় বৈধ নথিপত্র ছাড়াই।' পরে মোদী সরকার উদ্বাস্তুদের নাগরিকত্ব প্রদানের জন্য ১৯ জুলাই ২০১৬ সালের পূর্বের প্রতিশ্রুতিমতো লোকসভায় পেশ করে ১৯৫৫ সালের নাগরিকত্ব আইনের সংশোধনী বিল-২০১৬। আর সেই বিল লোকসভার বাদল অধিবেশনে ১১ আগস্ট, ২০১৬ আলোচনার জন্য তোলা হয়। কিন্তু মুসলমান তোষণের রাজনীতিতে বিশ্বাসী কংগ্রেসের বিরোধিতার ফলে বিলটি চলে যায় যৌথ সিলেক্ট কমিটিতে। প্রস্তাবিত নাগরিকত্ব সংশোধনী বিলের পটভূমি কিন্তু সেই ১৯৪৭ সালের সাম্প্রদায়িক বিভাজন। কারণ পাকিস্তান, বাংলাদেশ ও আফগানিস্তানে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের উপর নির্যাতন সর্বজনবিদিত। শুধু তা নয়, ওই সংখ্যালঘুদের সঙ্গে বৈষম্যমূলক আচরণ করা হয়। তার জ্বলন্ত প্রমাণ হচ্ছে বাংলাদেশ সরকারের ধর্ম মন্ত্রালয়ের বাজেট। সংখ্যালঘু হিন্দু জনগোষ্ঠীর উপর লাগাতার আক্রমণের পিছনে রয়েছে একটিমাত্র কারণ। কারণটি হচ্ছে 'এথনিক ক্লিনজিং', অর্থাৎ বাংলাদেশকে সংখ্যালঘু-শূন্য দেশে পরিণত করা। বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের সংখ্যাগুরুরা প্রকৃতপক্ষে চায় না— বাংলাদেশে একটি হিন্দু পরিবারের অস্তিত্ব থাকুক। তাই চলছে ধারাবাহিক আক্রমণ। তার জ্বলন্ত আরেকটি প্রমাণ হচ্ছে পাকিস্তান ও বাংলাদেশের সরকারি জনগণনার রিপোর্ট। এই কারণেই তাদের ভারতে আশ্রয় নেওয়াটা অতি স্বাভাবিক। তাই কেন্দ্রের সরকার মানবিক কারণেই ২০১৫ সালের ৮ সেপ্টেম্বর তারিখে দু'টি রুলসের সংশোধনী করে তাদের ভারতে বসবাসের অধিকার প্রদান করে। আর বর্তমানে ওইসব নির্যাতিত, ছিন্নমূল উদ্বাস্তু হিন্দুদের ভাসমান না রেখে কেন্দ্র সরকার দেশীয়করণের মাধ্যমে ভারতের নাগরিকত্ব প্রদানের জন্য সংসদে পেশ করেছে ১৯৫৫ সালের নাগরিকত্ব (সংশোধনী) বিল ২০১৬। এই বিল আইনে রূপান্তরিত হলে বিশেষ করে উত্তর-পূর্ব ভারত, পশ্চিমবঙ্গ এবং ওড়িশা রাজ্যের জনগণ লাভবান হবে। যা কংগ্রেস স্বাধীনতার পর দীর্ঘদিন শাসন ক্ষমতায় থেকেও করতে পারেনি, মোদী সরকার সেই কাজটা সম্পূর্ণ করার এই চেষ্টা ঐতিহাসিক এবং সাহসী পদক্ষেপ।

মোদী সরকার ক্ষমতায় আসার প্রথম বছরেই প্রায় ৬০ হাজার কোটি টাকা বিভিন্ন মন্ত্রক মারফত উত্তরপূর্ব ভারতের রাজ্যগুলিকে প্রদান করে। উত্তরপূর্ব ভারতের মণিপুর রাজ্যের জন্য নির্মাণ হচ্ছে একটি 'স্পোর্টস ইউনিভার্সিটি'। ২০১৬ সালে উত্তরপূর্ব ভারতের রাজ্যগুলির জন্য রেল বাজেট বাড়িয়ে ৩৫ হাজার কোটি টাকা থেকে বাড়িয়ে ৪০ হাজার কোটি টাকা করা হয়েছে। ২০১৬-১৭ বছরে প্রায় ২৬টি নতুন ট্রেন চালু করবে রেলমন্ত্রক শুধু উত্তরপূর্ব ভারতে। ত্রিপুরা রাজ্যের আগরতলা স্টেশন থেকে বাংলাদেশের আখুড়া স্টেশনের মধ্যে প্রায় ১৬ কিলোমিটার রেলপথ নির্মাণের কাজ শুরু করেছে মোদী সরকার। ইতিমধ্যে মোদী সরকার আগরতলা থেকে গৌহাটি-দিল্লি পর্যন্ত ব্রডগেজ লাইন দিয়ে ট্রেন চালু করেছে। অসমের বরাক উপত্যকার প্রাণকেন্দ্র শিলচর থেকে আগরতলা এবং গৌহাটি ব্রডগেজ লাইন দিয়ে ট্রেন চালু হয়েছে। যা বিগত ৭০ বছরে হয়নি। মোদী সরকার অতি কম সময়ের মধ্যে বাস্তবায়িত করে তা দেখিয়েছে।

১৫ই আগস্ট বিশেষ সংখ্যা

২০১১ সাল থেকে ২০১৬ সাল পর্যন্ত যখন উত্তর-পূর্ব ভারতের অসম রাজ্যে শতবর্ষ পুরনো দল কংগ্রেস শাসন ক্ষমতায় ছিল তখন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে ছাত্র সংখ্যা কমেছে ৮ লক্ষ ১৫ হাজার ৫৬০ এবং বেসরকারি বিদ্যালয়গুলিতে ছাত্র সংখ্যা বেড়েছে ৩৬ লক্ষ ১ হাজার ২০৯। কংগ্রেসের ওই পাঁচ বছর রাজত্বকালে সমগ্র অসম রাজ্যে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় বন্ধ হয়েছে ১৮৯টি। কারণ বিদ্যালয়ে ছাত্র নেই। চলতি শিক্ষাবর্ষে ২৩৮টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নেই একজনও ছাত্র। আগামী দুই-তিন বছরের মধ্যে সমগ্র রাজ্যের আরও প্রায় ৭০০টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় বন্ধ হয়ে যাবে। কারণ ওইসব বিদ্যালয়ে সর্বাধিক ছাত্র সংখ্যা ৯ জন। অর্থাৎ মাত্র ১ থেকে ৯ জন ছাত্র-ছাত্রী নিয়ে রাজ্যে ৭০০টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা শিক্ষকতার নাম করে কংগ্রেস আমলে ওইসব বিদ্যালয় থেকে মাসের পর মাস মাইনা নিয়ে যাচ্ছে। চলতি শিক্ষাবর্ষে নাকি ওইসব বিদ্যালয়ে একজনও ছাত্রও নাম লেখায়নি ভর্তির জন্য। শুধু তাই নয়, অসমের গ্রামাঞ্চলে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা হচ্ছে ৬২ হাজার ৫২৩টি এবং তার মধ্যে ৫০ হাজার ৩২১টি গ্রামাঞ্চলে থাকা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৭০ বছরেও বিদ্যুতের আলো দেখতে পায়নি কচিকাঁচা শিশুরা। উল্লেখ্য, গ্রাম অঞ্চলে বিদ্যুৎ না থাকা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা গোয়া রাজ্যে হচ্ছে মাত্র ২টি, সেখানে গুজরাটে ১২২টি, হরিয়ানা রাজ্যে ২০৬টি, মিজোরাম রাজ্যে ৭৬০টি, মণিপুরে ২,৭৩৭টি, নাগাল্যান্ডে ১,২৯৮টি, ত্রিপুরা রাজ্যে ৩,২৯০টি, মেঘালয় রাজ্যে ৯,৭৪৮, পশ্চিমবঙ্গে এধরনের বিদ্যালয়ের সংখ্যা হচ্ছে ২২,৮৪৫টি। তাই বর্তমান মোদী সরকার উত্তর-পূর্ব ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের গ্রামাঞ্চলে থাকা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে 'দীনদয়াল উপাধ্যায় গ্রামজ্যোতি প্রকল্পের' অধীনে বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়ার প্রচেষ্টা শুরু করেছে। যা উত্তর-পূর্ব ভারতে এক বিরল দৃষ্টান্ত।

(নিবন্ধকার পেশায় আইনজীবী)

১৫ই আগস্ট
বিশেষ সংখ্যা

ভারতীয় বিদেশনীতির সাত দশক
নেহরু থেকে মোদী

প্রণয় রায়

১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা অর্জন করে আধুনিক ভারতবর্ষের পথচলা শুরু। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষে বিশ্বে এক নতুন শক্তি সাম্যের খেলা শুরু হয়ে যায়। ভারতবর্ষের মতো বিশাল এবং সামরিক দৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূখণ্ড যাতে কোনো ভাবে এই খেলায় না জড়িয়ে পড়ে রাষ্ট্রনেতারা স্বাধীনতার প্রাক্কালে সে বিষয়ে সচেষ্ট ছিলেন। সুতরাং স্বাধীনতা পেয়েও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জয়ী ব্রিটিশ সেনাপতি ও এশিয়া ভূখণ্ডের প্রধান মাউন্টব্যাটেনকে স্বাধীন ভারতের গভর্নর জেনারেল করা হয়। এটা ছিল স্বাধীন ভারতের বিদেশ নীতির প্রথম চমক। ১৯৪৮ সালে কাশ্মীরে পাকিস্তানের অর্তকিত আক্রমণকে সামরিক ভাবে প্রতিহত করে স্বাধীন ভারতবর্ষ প্রথম নিজের ক্ষমতার পরিচয় দেয়। জুনাগড় ও হায়দরাবাদ রাজ্যের বিলয় ছিল স্বাধীন ভারতের বিদেশনীতির প্রথম সাফল্য।

ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী নেহরু নিজের কাছেই রেখেছিলেন বিদেশ মন্ত্রকের দায়িত্ব। উন্নয়নকে সামনে রেখে ভারতবর্ষের বিদেশনীতি রচিত হয়। ভারতবর্ষ জাতিসঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। সেই সঙ্গে ভারতীয় সৈন্যবাহিনীও ছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন জয়ী বাহিনীর অংশীদার। ফলে স্বাধীনতার পর থেকেই বিশ্ব রাজনীতির অলিন্দে ঢুকে পড়ে ভারত। সে সময় দুই মহাশক্তির জোটের চরম দাপটের মধ্যে ভারতবর্ষ গড়ে তোলে তৃতীয় একটি জোট যার নাম 'জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন'। ১৯৫৩ সালে রাষ্ট্রসঙ্ঘে এ বিষয়ে প্রথম কথা উঠলেও ১৯৫৪-য় নেহরু কলম্বো ভাষণে জোটের রূপরেখা ঘোষণা করেন। ভারতবর্ষ হয়ে ওঠে রাষ্ট্রসঙ্ঘের পর সবচেয়ে বড় সংগঠনের স্বাভাবিক নেতা।

১৯৫০ সালে ফ্রান্স অধিকৃত চন্দননগর ও ১৯৫৪ সালে পণ্ডিচেরিকে ভারতীয় গণরাজ্যে শামিল করা ছিল ভারতীয় বৈদেশিক নীতির বিরাট সাফল্য। ১৯৫০ সালে চীন তিব্বত আক্রমণ করে। তিব্বত হলো চীন, ভারত, পাকিস্তান, নেপাল, বাংলাদেশে প্রবাহিত প্রধান নদীগুলির জন্মস্থান। এমন একটি প্রাকৃতিক সম্পদশীল দেশকে চীন বিনা বাধায় দখল করে। নেহরু তখন চীনা প্রেমে বিভোর। নেহরু নেতৃত্বাধীন ভারত আগবাড়িয়ে গণতান্ত্রিক চীন (তাইওয়ান)- এর দাবি নস্যাৎ করে কমিউনিস্ট চীনকে মান্যতা দেয়। রাষ্ট্রসঙ্ঘের সুরক্ষা পরিষদে স্থায়ী সদস্য হিসেবে তাইওয়ানের অধিকার কেড়ে বর্তমান কমিউনিস্ট চীনকে দেওয়ার পক্ষেও বিশ্বজনমত গড়তে সচেষ্ট হন নেহরু। ১৯৫০ সালে আমেরিকা-সহ বেশ কিছু দেশ এশিয়া থেকে চীনের বদলে ভারতকে সুরক্ষা পরিষদের স্থায়ী সদস্য হওয়ার আহ্বান জানায়। কিন্তু নেহরু অস্বীকার করেন। তার কথায়, 'চীনের সঙ্গে বন্ধুত্বের শর্তে ভারত কোনো সুবিধা নেবে না।' ১৯৫৪ সালে নেহরুর নেতৃত্বে ভারত-চীন পঞ্চশীল সন্ধি স্বাক্ষর করে। ১৯৫৫ সালে সুরক্ষা পরিষদের স্থায়ী পদের জন্য সোভিয়েত রুশও চীনের বদলে ভারতের পক্ষে মত দেয় কিন্তু নেহরু বেঁকে বসেন। নেহরু সহযোগী কংগ্রেসি-সহ বিশ্বনেতাদের পরামর্শ অবহেলা করে তিব্বতের উপর চীনা অধিকারকে স্বীকৃতি জানান। সফল হয় চীনা কূটনীতি। কমিউনিস্ট চীনকে রাষ্ট্রসঙ্ঘ-সহ অন্যান্য বিশ্বসংগঠনে প্রবেশের পথ করে দেন নেহরু। সেই সঙ্গে চীনা আশঙ্কার কাঁটা দূর করে ফেলেছি এই আত্মপ্রসাদে সেনার অপ্রয়োজনীয়তার পক্ষে সওয়াল করেন। তাতে সায় দেয় চীনাপন্থী ভারতীয় বামপন্থীরা। ফলে সেনার আধুনিকীকরণের কাজ বাধাপ্রপ্ত হয়।

১৯৬১ সালের ১৮ ডিসেম্বর গোয়ার পোর্তুগাল শাসকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে ভারত। দুই দিনের মধ্যে গোয়া মুক্ত করে ভারতীয় বাহিনী শৌর্যের পরিচয় দেয়। কিন্তু এ যুদ্ধে ভারতীয় বাহিনীকে বহু দশক ধরে করে রাখা অবহেলার ছাপ শত্রু দেশের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ১৯৬২ সালে আসে সেই কালো দিন। চীন ভারত আক্রমণ করেছে কী করেনি প্রধানমন্ত্রী নেহরুর এটা বুঝতেই চীনা বাহিনী লাদাখের বড় অংশ দখল করে নেয়। অন্যদিকে বামপন্থীরা ভারতই চীন আক্রমণ করেছে বলে সরকারের বিরুদ্ধে অসহযোগিতার বাতাবরণ তৈরি করে। বাংলা দৈনিক পত্রিকাগুলিতে চীনের পক্ষে পত্রাবলী ছাপা হয়। শেষ পর্যন্ত রসদহীন ভারতীয় বাহিনী শুধু শৌর্যকে সম্বল করে যুদ্ধে নামে। আশ্চর্যজনকভাবে চীন প্রথম দফায় পিছু হটে কিন্তু লাদাখ অঞ্চলের দখল ছাড়েনি। নেহরুও সে বিষয়ে আর কোনো পদক্ষেপ নেননি।

নেহরুর মৃত্যুর পর প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রীর হাত ধরে ভারতীয় বিদেশ নীতির দ্বিতীয় যুগ শুরু হয়। ১৯৬৫ আমেরিকান প্যাটন ট্যাঙ্কে সওয়ার হয়ে পাকিস্তান ভারত আক্রমণ করে। লালবাহাদুর সমস্ত জড়তা ভেঙে যুদ্ধের শেষ দেখে ছাড়ার ঘোষণা করেন। ভারতীয় বাহিনী পাকিস্তানকে পর্যুদস্ত করে দেয়। বিশ্ব নেতারা বিশ্ব শক্তিসাম্যকে তছনছ করতে সমর্থ লালবাহাদুরকে বন্ধুর বেশে তাসখন্দে নিয়ে যায় এবং আশ্চর্যজনক ভাবে ভারতের বিজয়ী সেনাপতি আলোচনার টেবিলে হেরে গিয়ে পাকিস্তানকে ক্ষমা করে সন্ধিপত্র স্বাক্ষর করেন এবং কফিনবন্দি হয়ে আসে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর মৃতদেহ। ভারতীয় কূটনীতি কালো অধ্যায় রচিত হয় সেদিন। বছরের মধ্যে দুই দুইটি যুদ্ধ, খাদ্যাভাব, আমেরিকার সঙ্গে খাদ্য চুক্তি স্বাক্ষর ইত্যাদি

১৫ই আগস্ট বিশেষ সংখ্যা

অপমান দেশে নিরাশা নিয়ে আসে। কিন্তু দেওয়ালে পিঠ ঠেকে গেলেই শুরু হয় মরণপণ প্রচেষ্টা। ফলে ৬০ দশকের শেষে ঘটে যায় সবুজ বিপ্লব। ভারত খাদ্যে হয়ে ওঠে স্বয়ং নির্ভর।

১৯৭১ প্রধানমন্ত্রী ও বিদেশমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী। বাংলাদেশে পাকিস্থানি অত্যাচারের প্রতিকারে নামে ভারত। পকেটে তখন ভারত-সোভিয়েত ২০ বর্ষীয় সুরক্ষা চুক্তি। বদলে যায় বিশ্বের ভূগোল। জন্ম নেয় নতুন রাষ্ট্র বাংলাদেশ। সারা বিশ্বের সমর্থন পায় ভারতবর্ষ। হয়ে ওঠে বিশ্বনেতা পদের দাবিদার। স্বীকৃতি পায় দক্ষিণ এশিয়ার প্রধান শক্তি হিসেবে। সিকিমের মতো রাজ্য ভারতে শামিল হয়। ইসরোর সাফল্য, ১৯৭৪ সালে প্রথম পরমাণুবোমা পরীক্ষা ভারতকে প্রযুক্তি ও সৈন্য শক্তিতে অনেকটাই এগিয়ে দেয়। ফলে বিশ্বরাজনীতিতে প্রভাব বাড়ে।

১৯৭৭ বিদেশমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ীর হাত ধরে বিদেশ মন্ত্রকের নতুন যুগ শুরু হয়। সারা বিশ্বে থাকা ৫ কোটি ভারতীয় ও ভারতীয় বংশোদ্ভূতদের সহযোগিতায় নতুন 'সফট্' পাওয়ার হিসেবে বিশ্বে ভারতবর্ষ আত্মপ্রকাশ করে। ১৯৮৯ সালে শ্রীলঙ্কা সমস্যায় ভারতের সহযোগিতা, মালদ্বীপে সেনা অভ্যুত্থানের প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করে ভারত বিশ্ব শক্তিরাজনীতির কেন্দ্রে নিজের স্থান পাকা করে নেয়।

৮০-র দশকের শেষে বিশ্বরাজনীতিতে ভূমিকম্প আসে। সোভিয়েত ভেঙে যায়, তৈরি হয় শক্তি অসাম্য। শূন্যস্থান পূরণে প্রতিযোগিতায় নামে এশিয়ার দুই দেশ চীন ও ভারত। পাকিস্তানের কাঁটা ও ভারতের রাজনৈতিক অস্থিরতা সেই সঙ্গে চীনের ট্যাঙ্কের ছত্রচ্ছায়ায় গড়ে ওঠা কমিউনিস্ট একনায়কতন্ত্র চীনের অর্থনৈতিক শক্তিকে কয়েক গুণ বাড়িয়ে দেয়। বিশ্ববাসীর চোখের আড়ালে চীনা জনগণ চরম অত্যাচারের মধ্যে সুলভ শ্রমিক দিয়ে চীনকে গড়ে তোলে বিশ্বের কারখানা। ১৯৯১ সালে ভারতে অর্থনীতিতে শুরু হয় বিশ্বায়ন। প্রাথমিক ভাবে মনে হয়েছিল ভারতীয় কোম্পানিগুলি হয়তো পিছিয়ে পড়বে। কিন্তু সে ভাবনাকে দূরে ঠেলে শুরু হলো নতুন দৌড়। ২৫ বছরের মাথায় উন্নয়নের দৌড়ে ভারত চীনকে পিছনে ফলে সবচেয়ে দ্রুত উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করে। ১৯৯৮ প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারীর সদর্পে ঘোষণা করলেন, 'বুদ্ধ হেসেছে'। বিশ্ববাসী পেল আণবিক বোমায় সজ্জিত ভারতবর্ষ। আমেরিকা, জাপান, ইউরোপীয় ইউনিয়ন ভারতকে এক ঘরে করার চেষ্টা করলো। বিদেশি সাহায্য বন্ধ হলো। প্রধানমন্ত্রী বাজপেয়ীর আহ্বানে এগিয়ে এলেন প্রবাসী ভারতীয় ও দেশবাসীরা। ১৯৯৯-এ কারগিল যুদ্ধ ভারতীয় কূটনীতির চূড়ান্ত সাফল্য। বিশ্ববাসী বুঝল ভারত কতটা দায়িত্বশীল। কূটনীতির নতুন অধ্যায় শুরু হলো। ১৯৯৮ থেকেই এখনও পর্যন্ত ফ্রান্স, আমেরিকা, রাশিয়া, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, জাপান, ইজরাইল-সহ ২৪টি দেশের সঙ্গে সামরিক সহযোগিতার চুক্তি করে ভারত। শুরু হয় বিভিন্ন দেশের সঙ্গে বার্ষিক সামরিক মহড়া। ভারতীয় বংশোদ্ভূত ও প্রবাসী ভারতীয়দের স্বীকৃতি দিতে তৈরি হয় প্রবাসী ভারতীয় বিষয়ক মন্ত্রক।

২০০৭ সালে বামপন্থীদের চাপ প্রতিরোধ করে প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংহ ভারত-আমেরিকা চুক্তি সম্পাদন করেন। দূর হয় পরমাণু দুনিয়ার অস্পৃশ্যতা। যদিও চুক্তি নিয়ে কিছু বিতর্ক রয়েছে। ২০১৪ সালে ক্ষমতায় এল নিরঙ্কুশ সমর্থন-সহ বিজেপি সরকার। পশ্চিমি মিডিয়া লিখল, 'ভারতবর্ষ প্রকৃত স্বাধীনতা পেল।' প্রধানমন্ত্রী মোদী নিজের শপথগ্রহণে সার্ক দেশের প্রধানদের আমন্ত্রণ জানিয়ে বাজিমাত করলেন। শাসনের প্রথম দিনই দক্ষিণ এশিয়ার নিজের কৃতিত্ব প্রতিষ্ঠা করলেন। তারপর শুরু হয় একের পর এক দেশ সফর। পাকিস্তান ও মায়ানমারে সার্জিক্যাল স্ট্রাইক নতুন ইতিহাস রচনা করে। ভারত প্রতিষ্ঠিত মিসাইল টেকনলজি কন্ট্রোল রিজিমের সদস্যপদ পায়। চীন ছাড়া অন্য চার মহাশক্তি সুরক্ষা পরিষদে ভারতের প্রবেশকে সমর্থন জানিয়েছে। এই মুহূর্তে ভারতবর্ষ বিশ্বে ইসলামি সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে চলা যুদ্ধের প্রধান সেনাপতি। ভারতের প্রয়াসে স্থাপিত হয়েছে সার্ক, BIMSTEC, BRICS-এর মতো সংগঠন। ভারত এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্ক, BRICS ব্যাঙ্ক, পূর্ব এশিয়া সামিট, G-20, WTO, IMF, G-8+5, SCO-সহ বহু সংগঠনের সদস্য। রাষ্ট্রসঙ্ঘের ৩৫টি শান্তি মিশনে ভারতের এক লক্ষ সেনা অংশগ্রহণ করেছে। ভারত এখন বিশ্বে দান গ্রহীতা দেশ থেকে দাতা দেশে পরিণত হয়েছে। ২০১৫ সালে ভারত অন্য দেশকে সহযোগিতা করেছে প্রায় ৮ হাজার কোটি টাকা। চতুর্থ শক্তিশালী বাহিনী, ষষ্ঠ বড় অর্থনীতি, উন্নত সভ্যতা-সহ ভারত এখন এক মহাশক্তি। বর্তমানে চীনের সঙ্গে স্নায়ুযুদ্ধে ভারতের কঠোর অবস্থান ভারতীয় বিদেশনীতির সাবালকত্ব প্রাপ্তি বলে বিশেষজ্ঞদের মত। ▮

১৫ই আগস্ট
বিশেষ সংখ্যা

চীনা ড্রাগন ঘিরে ধরছে? উপায়ও আছে

ড. অচিন্ত্য বিশ্বাস

চীন ভারতের সম্পর্ক সিকিম-ভুটানের সীমান্তবর্তী ডোকালাম নিয়ে গভীর উদ্বেগজনক পরিস্থিতিতে উপস্থিত। ভারত-চীন সীমান্তে সমস্যার সঙ্গে জুড়ে গেছে অনেক বিষয়। প্রথম ভাবনা, চীন কি ভারতের সঙ্গে যুদ্ধে ইচ্ছুক? নাকি এটা লোক দেখানো? হতে পারে, চীন চাইছে পাকিস্তান সীমান্তে ভারতীয় সেনাবাহিনী একটু চাপ কমাক। একথা ঠিক, চীন সামরিক শক্তিতে সামান্য এগিয়ে। কিন্তু ভারতের তুলনায় তাদের সীমান্ত-সমস্যা তো প্রায় সমস্ত প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সঙ্গেই! আন্দামান-নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের কাছে মালাক্কা হয়ে খনিজ তেল না পেলে চীন যথাযথ সৈন্য সমাবেশ ঘটাতে পারবে না।

দ্বিতীয় ভাবনা, ভারত এখন ১৯৬২-র যুদ্ধ (২০ অক্টোবর থেকে ২১ নভেম্বর)-এর মতো অবস্থায় নেই। সে সময় মাত্র বিশ হাজার ভারতীয় জওয়ান আক্রান্ত হয় আশি হাজার চীনা সৈনিকের দ্বারা। বিমানবাহিনীর অবসর প্রাপ্ত কমান্ডার রমেশ ফাড়কে লিখেছেন, জওহরলাল নেহরু তখন সেনাবাহিনীর সঙ্গে সম্পর্কই রাখতেন না। তাঁর বিশ্বাসই ছিল না— চীন ভারতকে আক্রমণ করতে পারে। ফাড়কের মতে বাষট্টির যুদ্ধে হারের কারণ 'disconnect between the military and civilian political ledership'. চীন নিশ্চয় জানে, ভারতের বর্তমান অবস্থা, সরকার-নেতৃত্ব আর সেনাবাহিনীর সম্পর্ক অনেক স্বচ্ছ ও সমর্থ।

ভারত-চীন বাণিজ্য-সম্পর্ক এখন যে অবস্থায় তাতে চীন ভারতের সঙ্গে সংঘাতে যাবে কিনা সন্দেহ। ১৯৮৪-তে চীনকে ভারত সরকার সবচেয়ে সুবিধা প্রাপ্ত দেশ (Most Favared Nation) হিসাবে গ্রহণ করেছে; ১৯৯৪-তে দুই রকম শুল্কনীতি (double taxation) বন্ধ হয়েছে। যথারীতি চীন-ভারত বাণিজ্য সম্পর্ক গভীর ও ব্যাপক চেহারা পেয়েছে। ২০০২ খ্রিস্টাব্দে বাণিজ্যের পরিমাণ ছিল ৪৮০ কোটি মার্কিন ডলার। ক্রমেই এই পরিমাণ বেড়েছে। ২০০৫ খ্রিস্টাব্দে ১৮৭০ কোটি মার্কিন ডলার; ২০০৮ খ্রিস্টাব্দে ২০০০ কোটি ডলার আর ২০১০ খ্রিস্টাব্দে এর পরিমাণ হয়েছে ৩০০০ কোটি ডলার। এই বাণিজ্যের বাস্তব চেহারা আরও স্পষ্ট হতে পারে যদি আমরা ভারত চীনের বাণিজ্য সামগ্রী সম্পর্কে দৃষ্টিপাত করি।

মোট কথা, চীন ভারত থেকে শিল্পে ব্যবহার্য পণ্য নেয়, ভারতে পাঠায় ব্যবহার্য বস্তু— ভোগ্যপণ্য। এর ফলে বাণিজ্য-সম্পর্কে বিপুল পরিমাণ লাভ হয় চীনের। ১৩ জুলাই ২০১৭-তে দেখা যাচ্ছে চীনে ভারতের পাঠানো দ্রব্যাদির পরিমাণ ২১ শতাংশ কমে গেছে, এসব দ্রব্যের চাহিদা কমার অর্থ হলো চীন এখন নিজেরাই তৈরি করছে। অন্য পক্ষে ভারত কিন্তু চীনের কাছে উত্তরোত্তর বৃহৎ বাজারে পরিণত হয়েছে। দুই দেশের বাণিজ্যে ভারসাম্য নেই— চীন লাভ করছে— ৪৬৫৬০ কোটি মার্কিন ডলার। এর অর্থ তাৎপর্য না বোঝার কারণ নেই। প্রথম, আমাদের দেশ মুক্ত বাজার অর্থনীতির ফলে চীনের পণ্যে ছেয়ে গেছে। সাধারণ মানুষ এইসব দ্রব্যাদি উপভোগ করছে। বিকল্প নেই— আমাদের জাতীয় শ্লাঘার পক্ষে এই তথ্য মোটেই আনন্দের নয়। দ্বিতীয়, চীন কি এত বড় বাজারকে এড়িয়ে উপেক্ষা করে যুদ্ধ চাপিয়ে দেবে? সহজ সাধারণ উত্তর না। এতে তাদের বাণিজ্য বিস্তারের ক্ষতি হবেই। এ প্রসঙ্গে একটি কথা বলে নিই। দুটি সিমেন্ট কোম্পানি এখন ভারতে প্রবেশ করেছে। লংকৌ কানলিন সিমেন্ট কোং আর ইইংদে ড্রাগন মাউন্টেন সিমেন্ট কোং। এই দুটি সংস্থা বিপুল পরিমাণে সিমেন্ট ভারতে পাঠাচ্ছে! অথচ এগুলির নাম জানা যায় না।

ওরা নিশ্চয় ভারতের বিভিন্ন সহযোগী সংস্থার নাম প্রতীক ধার করছে! এরকম ছল চাতুরিতে ঘেরা চীন-ভারত বাণিজ্য সম্পর্ক। 'মন কি বাত'-এর শেষ বক্তৃতায় প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'এ বছর আমরা যেন মৃণ্ময় গণেশের পুজো করি।' আড়াল কথাটি সবাই বুঝবেন— চীনা গণেশকে পুজো করলে আমাদের সিদ্ধি লাভ হবে না। চীন কেন ডোকালাম তথা লাচেন উপত্যকায় অধিকার কায়েম করতে চাইছে? ১৮,৭০০ ফুট উঁচু এই অঞ্চল থেকে সিকিম ও ভুটানের উপর নজর রাখা সম্ভব হবে— শুধু তাই নয়, এর ফলে মাত্র দেড়শো কিলোমিটার দূরে শিলিগুড়ি অঞ্চল কবজা করাও অসম্ভব নয়। চীন ভারতের দিকে বহুদিন ধরে চাপ সৃষ্টি করার পরিকল্পনা করে চলেছে। লাদাখ-সিকিম-অরুণাচল তাদের মতে ভারতের অংশ নয়। নেপাল আর ভুটানও তারা দখল করতে চায়। মেচী নদীর পশ্চিমে ধুলাবাড়ি- কাঁকড়ভিটা অঞ্চলে নেপাল তরাই অঞ্চলে বহু চীনা ভাষা শিক্ষাকেন্দ্র গড়ে উঠেছে। নেপালে এখন মাওবাদী সরকার। একদা নেপালরাজ ভারতের অন্তর্গত হবার জন্য আবেদন করেছিলেন; ভারতের স্বাধীনতার ঠিক আগে। অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু সেই আবেদন নাকচ করেন বলে শোনা যাচ্ছে। এখন তিব্বতের পাঁচটি আঙুল বলে চীন ধরেছে— লাদাখ-নেপাল-সিকিম-ভুটান আর অরুণাচল প্রদেশকে। জওহরলাল নেহরুর পঞ্চশীল নীতি— বান্দুং সম্মেলন— নির্জোট আন্দোলন একটি বৃহৎ শূন্যে পর্যবসিত হয়েছে। এতদিনের বিভ্রান্তি-ভুলত্রুটি রাতারাতি সংশোধন করা সম্ভব নয়। তবুও, এখনকার সরকার সমস্ত সমস্যা সমাধানের দূর ও নিকট— দুইরকম ব্যবস্থাই গ্রহণ করবেন বলে বিশ্বাস জন্মাচ্ছে। দেশে থেকে যারা চীনের চেয়ারম্যানকে ভারতের চেয়ারম্যান ভাবতে চান, দেশকে বিকিয়ে দিতে চান, গোপনে চীনের রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে আর হৈচৈ করতে থাকেন— সেরকম বিরোধী দল ও নেতাদের উপর ভরসা করা সম্ভব নয়।

চীনের সংবাদপত্রে ক্রমাগত লেখা হচ্ছে, ভারতের মতো নিয়ম নিষ্ঠাহীন নিত্য গোলযোগের দেশের কিছু মানুষ নাকি উগ্র জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্র-নির্মাণের চেষ্টা করছে বলেই তারা ডোকালাম বা অন্য সব অঞ্চলে সৈন্যসমাবেশ করছে। ভারতকে উপযুক্ত শিক্ষা না দিয়ে তারা ছাড়বে না। অন্যদিকে ভারত মহাসাগরে বঙ্গোপসাগর আরব সাগরে অধিকার বিস্তারে চীন ভয়ঙ্কর আধিপ্যতবাদী কৌশল চালাচ্ছে। শুধু ডোকালাম নয়--- হিমাচল প্রদেশের কিন্নৌর আর লাহুল স্পিতির সীমান্ত এলাকায় হেলিকপ্টার উড়ছে— রাস্তা তৈরি করছে চীনা বাহিনী। শ্রীলঙ্কার সমুদ্র বন্দর 'হামবানটোটা' এখন পুরোপুরি চীনের অধিকারে এসে গেছে। পানস সৌরদৌকোইতাসের ভাষায় এটি চীনের অধিকৃত অঞ্চল 'semi colony' হয়ে গেছে। একই অবস্থা সিপিইসি বা China-Pakistan Economic Corridor-এর। এর কাজ শেষ হবার পথে। গোয়াদর-বন্দর প্রায় চূড়ান্ত অবস্থায়। চীন থেকে পাক অধিকৃত কাশ্মীর-বিতর্কিত বালটিস্তান আর গিলগিট (এই অঞ্চলগুলি কিছুতেই পাকিস্তানের অন্তর্গত নয়) হয়ে গোয়াদর পর্যন্ত পথের একদিক খুলে চীন তাদের আধিপত্যবাদী কীর্তি চালিয়ে যাচ্ছে! ইরানে চারবাহার বন্দর গড়ে, বালুচিস্তানের স্বাধীনতায় সমর্থন দিয়ে ভারত এই চালের বিরুদ্ধে সম্ভব মতো প্রতিক্রিয়া জানাচ্ছে। একে মাঝপথে আটকে দিতে চায় চীনের দালাল কমিউনিস্ট আর দুর্নীতিতে আকণ্ঠ নিমজ্জিত কিছু ব্যক্তি ও দল। সমস্ত জাতীয়তাবাদী দেশবাসী এ ব্যাপারে সরকারের পাশে থাকতে হবে। অন্য পথ নেই।

১৫ই আগস্ট বিশেষ সংখ্যা

ভারত চীনকে পাঠায়	চীন ভারতে পাঠায়
তৈলবীজ, লবণ, অজৈব রাসায়নিক দ্রব্য, প্লাস্টিক, রবার, চশমার সামগ্রী, চিকিৎসাবিদ্যায় ব্যবহার্য যন্ত্রপাতি, আকরিক, লোহা, কার্পাস তুলো।	সস্তা বৈদ্যুতিক সামগ্রী, খেলনা, জামাকাপড়, জুতো, মোবাইল, সিমেন্ট, কলম ছাতা, রান্নাঘরের সামগ্রী।

প্রিটোনিয়া প্রকাশিত নতুন বইয়ের সম্ভার

পরিমলকান্তি ভট্টাচার্য
মন ক্যামেরা
₹ ২০০

দেবীপ্রসাদ রায়
প্রসঙ্গতঃ মানবেন্দ্রনাথ (এম.এন.রায়)
₹ ২০০

ড. সিলিনা দে সরকার (বসু)
কথা সাহিত্যিক বুদ্ধদেব বসু
₹ ২৫০

সুনীল দাস
চারটি রহস্য উপন্যাস
₹ ২০০

প্রদীপ ঘোষ
লোকসংস্কৃতির বিপন্নতা ও অন্যান্য
₹ ১৫০

হরিবংশ রাই বচ্চন
অনুবাদ : সুমিতা ভৌমিক
মধুশালা
₹ ১০০

নির্মল ঘোষ
আখতারুজ্জামান ইলিয়াস সংশয়ে ও স্বপ্নে
₹ ১৫০

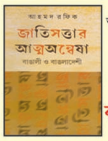

আহমদ রফিক
জাতিসত্তার আত্মঅন্বেষা বাঙালী ও বাঙলাদেশী
₹ ২০০

শেখর সেনগুপ্ত
শ্রী অরবিন্দ : সার্বিক মূল্যায়ণ
(১ম খণ্ড) ₹ ২৫০

আহমদ রফিক
এই অস্থির সময়
₹ ১৭৫

ড. মনিমোহন ভট্টাচার্য
স্বামীজী পুত্র নেতাজী
(১ম খণ্ড) ₹ ৩৫০

শেখর সেনগুপ্ত
পঞ্চ ঋষির রমণীচক্র
₹ ২৫০

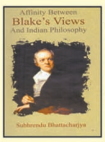

Dr. Subhrendu Bhattacharjya
Affinity between Blake's Views And Indian Philosophy
INR : 500

ড. বিজয় আঢ্য
পুরাণের পৃষ্ঠা থেকে
₹ ২০০

বিপ্লব মজুমদারের
রণিদা রহস্য ট্রিলজি
₹ ২৫০

সৌরকুমার বসু
শান্তিনিকেতন ও নকশাল আন্দোলন
₹ ২০০

সাতটি রহস্য উপন্যাস
₹ ৩৫০

কথামৃতসার
(শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ কথামৃত অবলম্বনে)
সংকলক জীবনীকার
মণি বাগচি
₹ ২০০

অর্পণ
একটি মননশীল পত্রিকা
● আপনার মূল্যবান লেখাটি পাঠান মনোনীত হলে আমরা প্রকাশ করব।
সম্পাদক : প্রদীপ ঘোষ ●যোগাযোগ : 9831145588

প্রিটোনিয়া
১৪ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৯ ফোন : ২২৪১ ২১০৯, ৬৪৫৪-২১০৯
email : publishers.pritonia2015@gmail.com
visit : www.pritoniapublishers.com

স্বস্তিকার সকল পাঠক-পাঠিকা, বিজ্ঞাপনদাতা ও শুভানুধ্যায়ীকে আন্তরিক অভিনন্দন—

A Well Wisher

সুরেন্দ্র চন্দ্র বসাকের
অত্যাধুনিক গয়নার ডিজাইনের ক্যাটালগ
সুপার
যে কোন স্বর্ণকারকে দেখাতে বলুন
ক্যাটালগের জন্য যোগাযোগ করুন
9830950831

ALWAYS EXCLUSIVE
Vandana ®
NR
SAREES ● SUITS
Mfg. of Cotton Printed & Embroidary Sarees
Contact No. : 033-22188744 / 1386

পোখরানে পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণের পর তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ী।

স্বাধীন ভারতে বিজ্ঞান সাধনা

ড. জিষ্ণু বসু

পৃথিবীর মধ্যে বিজ্ঞানের অগ্রগতিতে যে দেশের ভূমিকা সবচেয়ে বেশি সেটা ভারতবর্ষ। কথাটিতে একবিন্দু অতিকথন নেই। আজকের বিজ্ঞানের মূলে যত অঙ্ক তা সম্ভব হয়েছে কেবল একটি মাত্র আবিষ্কারের জন্য। তা হলো শূন্য (০)। ১, ২, ৩, ৪... করে ৯ এর পরে যে দশ, এই এক আর শূন্য। অর্থাৎ দশমিক পদ্ধতি না হলে গণিতের অগ্রগতি সম্ভব ছিল না। ওই পদ্ধতি পরে আরবদের মাধ্যমে ইউরোপে যায়। শ্রীধর আচার্যের দ্বিঘাত সমীকরণের পদ্ধতিও আজ সারা পৃথিবীতে সমাদৃত। শুধু গণিতে নয়, পদার্থবিদ্যা, রসায়ণ, চিকিৎসাশাস্ত্র, মনোবিদ্যা প্রতিটি ক্ষেত্রে ভারতীয়দের অবদান দেখে সমগ্র বিশ্ব মোহিত হয়ে গেছে। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় ভারতীয় রসায়ণ গবেষণার পরম্পরাগত ঐতিহ্য তার অসামান্য গ্রন্থ 'হিস্ট্রি অব হিন্দু কেমিস্ট্রি'তে তুলে ধরেছেন। স্বামী বিবেকানন্দের ভাষাতে বলতে গেলে, সমগ্র পশ্চিমি দুনিয়া যখন গাছে গাছে ঘুরে বেড়াচ্ছে তখন আমাদের আর্যভট্ট ভাস্করাচার্যের মতো বিজ্ঞানীরা মহাবিশ্বের গূঢ়রহস্য আবিষ্কারে মগ্ন ছিলেন। শুশ্রুতের মতো বিজ্ঞানী মানবদেহের ব্যবচ্ছেদ করে উদ্ভাবন করেছিলেন শল্য চিকিৎসার প্রয়োজনীয় যন্ত্র, চরক খুঁজে পেয়েছিলেন শত শত ভেষজের গুণ। আরবদের ভারত আক্রমণের ঠিক আগে পর্যন্ত সারা পৃথিবীতে বিজ্ঞান প্রযুক্তিতে ভারতবর্ষের সমকক্ষ কেউ ছিল না।

গত শতাব্দীকে পৃথিবী পদার্থ বিজ্ঞানের শতাব্দী হিসাবে গণ্য করে। কারণ পৃথিবীর চেহারাটা পাল্টে দিয়েছে পদার্থবিজ্ঞানের কয়েকটি আবিষ্কার। মানুষ তার জ্ঞানের জগতের সম্পূর্ণ একটি দিগন্ত খুলে ফেলেছে। ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র তরঙ্গ থেকে অবআণবিক কণার গঠন পর্যন্ত সব জায়গাতেই পদার্থবিজ্ঞানের বিস্ময়। আর এর সব গুরুত্বপূর্ণ জায়গাগুলিতেই আছে ভারতীয় বিজ্ঞানীদের অবদান। আজকের মোবাইল ফোন, টেলিভিশন, রেডিও, যুদ্ধজাহাজের সোনার যন্ত্রাদি থেকে রান্নাঘরের উনোন কোনো কিছুই পাওয়া যেত না যদি না স্যার জগদীশচন্দ্র বসু মাইক্রোওয়েভ আবিষ্কার করতেন। কথাটা আশ্চর্য মনে হলেও শতকরা একশোভাগ সত্য। তেমন মহাবিশ্বের গঠন, উৎপত্তি ভবিষ্যৎ বর্ণনার জন্য আজ যে সর্বগ্রাহ্য মতবাদ তার মূলে আছে এক অব আণবিককণা, 'বোসন'। আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু আইনস্টাইনের অপেক্ষিকতাবাদ তত্ত্বের এক বিশেষ সংযোজন করেছিলেন যার নাম— 'বোসআইনস্টাইন স্ট্যাটেসটিকস্।' এই তত্ত্ব আজকের মহাবিশ্বের বর্ণনায় অপরিহার্য। আচার্য বসুর নামে ওই অবআণবিক কণার নাম দেওয়া হয়েছে 'বোসন'। আজকের পদার্থবিদ্যা নোবেলজয়ী চন্দ্রশেখর ভেঙ্কটরমনের 'রমন এফেক্ট' ছাড়া কতটুকু এগোতে পারত?

একটি রোগের জীবাণু প্রথমে মানুষের শরীরে জন্ম নিয়ে, তারপর যক্ষ্মার জীবাণুর শরীরে বড় হয়ে আবার মানুষের শরীরে ফিরে আসতে পারে এমন অদ্ভুত বৈজ্ঞানিক সত্য শুনিয়ে সারা পৃথিবীকে অবাক করে দিয়েছিলেন যে চিকিৎসা বিজ্ঞানী সেই রোনাল্ড রস ভারতবর্ষে জন্মেছিলেন, এখানেই গবেষণা করেছেন। ১৮৫৭ সালে আলমোড়াতে জন্ম রোনাল্ড রসের। পক্ষান্তরে ভারতীয় বংশোদ্ভূত বা ভারতে জন্মেছেন এমন অনেক বিজ্ঞানী বিদেশে থেকে যুগান্তকারী কাজ করেছেন। অনেকে নোবেল পুরস্কারও পেয়েছেন।

সুব্রহ্মণিয়ম চন্দ্রশেখর তারাদের জন্ম, মৃত্যু, ভবিতব্যের সূচক 'চন্দ্রশেখর লিমিট' আবিষ্কার করেন। চন্দ্রশেখর যে সারা পৃথিবীর বিজ্ঞানমনস্ক ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে কত জনপ্রিয় তা বোঝা গিয়েছিল যখন নাসা তাদের যুগান্তকারী মহাকাশ গবেষণার জন্য 'অ্যাডভান্সড এক্স-রে অ্যাস্ট্রোফিজিক্স ফেসিলিটি (এ এক্স এ এফ) তৈরির কথা ভাবে। বিজ্ঞানের ছাত্রদের প্রশ্ন করা হয়েছিল এই অত্যাধুনিক মহাকাশ পর্যবেক্ষণ যন্ত্রের নাম কী হবে? যে নামটি উঠে এল তা হলো, 'চন্দ্র এক্স-রে অবজারভেটরি।' সুব্রহ্মণিয়ম চন্দ্রশেখরের নামে।

আজকের জীববিজ্ঞানের গবেষণার অন্যতম ক্ষেত্র 'জেনোমিকস'। এই বিপুলা পৃথিবীর জীববৈচিত্রের মূলে আছে 'জেনেটিক কোড।' সেই জেনেটিক কোড ও প্রোটিন সংশ্লেষণের মাধ্যমে জিনের ধারণা দিলেন যে বিজ্ঞানী, তিনি হরগোবিন্দ খুরানা। ১৯৬৮ সালে নোবেল পুরস্কার পেলেন। ১৯৫২ সালে তামিলনাড়ুর কুড্ডালোর জেলায় জন্মেছিলেন ভেঙ্কটরমন রামাকৃষ্ণান। ২০০৯ সালে 'রাইবোজম' বিষয়ে গবেষণার জন্য রামাকৃষ্ণান নোবেল পুরস্কার পেলেন। ভারতবর্ষের মহামানবের সাগরতীরে দাঁড়িয়ে যেসব বিজ্ঞানীর কথা অপরিহার্যভাবে মনে আসে সে সংখ্যাও নেহাত কম নয়। শুশ্রুত, দ্বিতীয় ভাস্কর, আর্যভট্ট থেকে জগদীশচন্দ্র বসু, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, বীরবল হাসানি, প্রশান্ত চন্দ্র মহালানবীশ, মেঘনাদ সাহা, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, সেলিম আলি, পঞ্চানন মহেশ্বরী, বিবি পাল, হোমি জাহাঙ্গির ভাবা, বিক্রম আম্বাভাই সারাভাই, ভার্গিস কুরিয়েন, এম এস স্বামীনাথন, এম কে ভাইনুবাপ্পু, ড. এপিজে আব্দুল কালামের নাম বললেও অবধারিতভাবে অনেক প্রাতঃস্মরণীয় বিজ্ঞানীর নাম বাদ চলে যায়।

স্বাধীন ভারতে পারমাণবিক শক্তি, মহাকাশ গবেষণা, বৈদ্যুতিন প্রযুক্তি ও প্রতিরক্ষা বিজ্ঞানে অসাধারণ সাফল্য এসেছে। আজ সারা পৃথিবীতে বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তিগত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত জনশক্তির নিরিখে আমাদের দেশ তৃতীয় বৃহত্তম। মিসাইল প্রযুক্তির ক্ষেত্রে ভারত বিশ্বের পাঁচটি প্রথম শ্রেণীর উৎক্ষেপক দেশের সঙ্গে একাসনে বসার যোগ্য। এর পিছনে বিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্রগুলির সঙ্গে সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিভাগগুলির অবদান আছে। ভারতীয় আন্ত-মহাদেশীয় ব্যালস্টিক মিসাইল প্রযুক্তিতে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রপতি পুরস্কারপ্রাপ্ত বিজ্ঞানী তপন কুমার ঘোষাল, গৌরহরি দাসের নাম অবশ্যই উল্লেখ্য। 'উইংস অব ফায়ার' গ্রন্থে এপিজে আব্দুল কালাম যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের এই 'প্রোজেক্ট ইমপ্যাক্টের' সাফল্যের কথা অকপটে স্বীকার করেছেন।

ইন্ডিয়ান স্পেস রিসার্চ অর্গানাইজেশন (ইসরো) মহাকাশ গবেষণায় পৃথিবীর ষষ্ঠ বৃহৎ গবেষণাকেন্দ্র। ১৯৬৯ সালে তৈরি হওয়ার মাত্র ৬ বৎসর পরেই প্রথম ভারতীয় উপগ্রহ আর্যভট্ট ১৯৭৫ সালে মহাকাশে পাঠানো হয়। এর পরে লাগাতার সাফল্য পেতে থাকে ইসরো। ২০০৮ সালে ভারতবর্ষ প্রথম চাঁদে পাড়ি দেয়, অভিযানের নাম হয় চন্দ্রায়ন-১। ইসরো এবং ডিপার্টমেন্ট অব স্পেস (ডি ও এস) এর পরে আরও উল্লেখযোগ্য অভিযানে নামে। তার নাম মঙ্গলায়ন। ২০১৩ সালের ৫ নভেম্বর এটির উৎক্ষেপণ হয়। এই সময় মার্স অরবিট মিশন (মোম) ২০১৪ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর গ্রহাণুদের বিপদ এড়িয়ে ঠিক মঙ্গলের কক্ষে পৌঁছে গেছে। মঙ্গলায়নের এই মঙ্গলময় যাত্রায় উৎসাহিত হয়ে ইসরো তার মঙ্গলায়ন-২ অভিযানের কথা ঘোষণা করেছে। ২০২১-২২ সাল নাগাদ পৃথিবী মায়ের মায়া কাটিয়ে মঙ্গলের কোলে যাবে এই ওরবাইটার, ল্যান্ডার ও রোভার-সহ দুর্দান্ত উপগ্রহ। এ বছরের ১৫ ফেব্রুয়ারি সতীশ ধাওয়ান মহাকাশ গবেষণা কেন্দ্র থেকে সফল ভাবে ১০৪টি উপগ্রহ উৎক্ষেপণ করা হয়। পি এস এল ডি-সি ৩৭-এর এটি একটি বিরাট সাফল্য। ২০১৪ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর ভারতের মঙ্গলায়ন নিয়ে নিউ ইয়র্ক টাইমস একটি ব্যঙ্গচিত্র প্রকাশ করেছিল। গোমাতার পূজারি ভারত 'এলিট স্পেস ক্লাবে' ঢোকার জন্য দরজায় টোকা দিচ্ছে। এবছর ইসরোর সাফল্যের পরে কার্টুনিস্ট সন্দীপ অধ্বর্যু তার অসাধারণ জবাব দিয়েছেন। ভারতবর্ষ গোমাতাকে সঙ্গে নিয়ে এলিটক্লাবের ভেতরে বসে আর ইউরোপ, আমেরিকার সাহেবরা তাদের 'উৎক্ষেপণ' নিয়ে বাইরে থেকে দরজায় ধাক্কা দিচ্ছে!

ভারতীয় আণবিক শক্তি প্রকল্পের স্থপতি হোমি জাহাঙ্গীর ভাবা। ১৯৬৬ সাল পর্যন্ত অক্লান্ত পরিশ্রমে তিনি এই পরমাণু গবেষণা কেন্দ্রটিকে বিশ্বমানের গবেষণা কেন্দ্রে পরিণত করেন। ১৯৭৪ সালের ১৮ মে প্রথমবার রাজস্থানের পোখরানে 'বুদ্ধদেব হাসলেন।' ভাবা অ্যাটমিক রিসার্চ সেন্টারের অধিকর্তা তখন রাজারমন্না। ভারত সম্পূর্ণ নিজের প্রচেষ্টায় একটি ১৩ কিলোটন পরমাণু অস্ত্র বিস্ফোরণ করে। এরপর থেকে গবেষণা দুটি ভাগে ভাগ হয়ে যায়। ডিপার্টমেন্ট অব অ্যাটমিক এনার্জি এবং অ্যাটমিক এনার্জি কমিশন যথাক্রমে সামগ্রিক পরমাণু গবেষণা ও শক্তি উৎপাদনে পরমাণু গবেষণার কাজে নিয়োজিত হয়। ১৯৯৮ সালের ১১ ও ১৩ মে ভারতবর্ষ পৃথিবীকে বাস্তবিকই চমকে দিল। ১১ তারিখে একটি ফিউসন ও দুটি ফিসন বোম ফাটায় ভারত। একদিন বাদে ১৩ তারিখে আরও দুটি ফিসন বোম। এই পরমাণু বোমের প্রযুক্তি সবটাই ভারতীয়। এই পাঁচটি বোমের একটি ছিল সাবকিলোটন। ১৯৯৮ সালের পোখরান-২-তে এই সাবকিলোটন বিস্ফোরণের একমাত্র কারণ ছিল শান্তির জন্য ব্যবহৃত পরমাণুর শক্তির গবেষণার সিমুলেশনের তথ্য তৈরি করা। পক্ষান্তরে ১৯৯৮ সালের ২৮ মে পাকিস্তানের বেলুচিস্তান প্রদেশের রাস কোহ পাহাড়ে যে চাখাই-১ বিস্ফোরণ ঘটানো হয়। সেই পাঁচটি বোম্বের সবকটিই চীনের প্রযুক্তি। ১৯৬৪ সালে ১৬ অক্টোবর চীন ঠিক যে প্রযুক্তির পরমাণু বোমা ফাটিয়েছিল পাকিস্তানকে ওই পুরাতন প্রযুক্তিই দিয়েছিল চীন।

আজ ভারতবর্ষের বহু প্রদেশে তৈরি হয়েছে পরমাণু বিদ্যুৎকেন্দ্র। নিউক্লিয়ার পাওয়ার কর্পোরেশন অব ইন্ডিয়া লিমিটেড দেশে ২২টি পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্র চালায়। সব মিলিয়ে ৫২টি ইউনিট আছে আজ দেশে। ১০০০ মেগাওয়াট থেকে ১০০ মেগাওয়াট পর্যন্ত উৎপাদনের রিঅ্যাক্টার আছে। আজ পরমাণু শক্তি প্রকল্পের রিঅ্যাক্টারও সম্পূর্ণ ভারতেই তৈরি হয়। দুর্ভাগ্যবশত রাজনৈতিক সদিচ্ছা ও জনমানসে ভুল ধারণার জন্য পশ্চিমবঙ্গের একমাত্র পরমাণু বিদ্যুৎ প্রকল্পটি মেদিনীপুরের হরিপুরে স্থাপন করা সম্ভব হয়নি। পরমাণু শক্তির ভবিষ্যৎ ভারতের হাতেই আছে। কারণ থোরিয়ামই হলো ভবিষ্যৎ পৃথিবীর পরমাণু জ্বালানি।

ভারতবর্ষের দক্ষিণের সমুদ্রতট হলো পৃথিবীতে থোরিয়ামের সর্ববৃহৎ ভাণ্ডার। তাই থোরিয়াম বেসড রিঅ্যাক্টর বাণিজ্যিক ভাবে সফল হলেই এই দৌড়ে সবচেয়ে এগিয়ে থাকবে ভারতবর্ষ। ■

১৫ই আগস্ট
বিশেষ সংখ্যা

ক্রীড়া-বিশ্বে উজ্জ্বল আনন্দ ও আডবানী

জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর সাত দশক অতিক্রান্ত। এই সত্তর বছরে দুনিয়া জুড়ে ঘটে গেছে কতই বিচিত্র ঘটনা। মানুষের পা পড়েছে চাঁদে। মাউন্ট এভারেস্টও আর অজেয় নয়। মানুষ খুঁজে নিয়েছে মহাসমুদ্রের তলদেশও। আন্টার্টিকায় হয়েছে কতই না অভিযান। তিন ভুবনের তিন মেরু অর্থাৎ এভারেস্ট, উত্তর ও দক্ষিণ মেরু জয় করে অভিযাত্রীরা বুঝিয়ে দিয়েছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ মানুষের অসাধ্য কিছুই নেই। আর এই অতিমাত্রিক অভিযানে শামিল হয়েছে এক বঙ্গতনয়ও। প্রথম ও একমাত্র ভারতীয় হিসেবে নৌবাহিনীর প্রাক্তন কম্যান্ডার সত্যব্রত দাস যে দিকচিহ্ন রচনা করে গেছেন তা অনুসরণ করে এগিয়ে যেতে হবে পরবর্তী প্রজন্মের অভিযাত্রীদের। তবে দুর্ভাগ্য সত্যব্রতর। তাঁর এই অতিমানবিক কীর্তির কথা কজন মানুষ জানেন। তেনজিং নোরগে যে পরিমাণ জনপ্রিয়তা ও বৈভবের অধিকারী হয়েছেন বিশ্বের প্রথম এভারেস্ট জয়ী হিসেবে তার সিকিমাত্র জোটেনি সত্যব্রতর ভাগ্যে। কিন্তু স্বাধীনতার সত্তর বছরে অ্যাডভেঞ্চার স্পোর্টসের কথা উঠলে সত্যব্রত দাসকে নিয়ে স্বতন্ত্র একটি অধ্যায় রচনা করতে হবে।

বিশ্বনাথন আনন্দও এমন এক ব্যক্তিত্ব যার নামে আস্ত একটি গ্রহাণুর নামকরণ করেছে নাসা। আসলে আনন্দ নিজেই এক গ্রহান্তরের মানুষ। এমন অত্যাশ্চর্য প্রতিভা ও দক্ষতার সমীকরণ মাটির পৃথিবীতে খুব একটা দেখা যায় না। একজন ভারতীয় এই দেশের দুর্নীতিগ্রস্ত আর্থ-সামাজিক পরিবেশ ও পরিকাঠামোর মধ্যে বেড়ে উঠে দাবার মতো উচ্চমাত্রিক এক খেলায় পাঁচবার বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হচ্ছেন এই ব্যাপারটা স্বপ্নেও দেখা সম্ভব নয়। ২৬০০-র বেশি এলো রেটিং নিয়ে সুপার গ্রান্ডমাস্টার বিশ্বনাথন আনন্দ বিশ্ব দাবার 'হল অব ফেমে' ইমানুয়েল লাসকার, আলেকজান্ডার আলেখিন, ববি ফিশার, গ্যারি কাসপারভের সঙ্গে একাসনে বসে আছেন, যা শতাব্দীর পর শতাব্দী জুড়ে ভারতবাসীকে বহির্বিশ্বে মাথা উঁচু করে

বিশ্বনাথন আনন্দ

পঙ্কজ আডবানী

চলতে বাড়তি আত্মবিশ্বাস জোগাবে।

প্রকাশ পাড়ুকোন ও পুলেল্লা গোপীচাঁদ ভারতের দুই অল ইংল্যান্ড জয়ী ব্যাডমিন্টন তারকা শুধু বিশ্বমানের খেলোয়াড় হয়েই থেমে থাকেননি। পরবর্তীতে আরও বড় দায়িত্ব ও ব্রতে অভিষিক্ত হয়ে একের পর এক চ্যাম্পিয়ন খেলোয়াড় তৈরি করে বিশ্বসংসারে দেশের পতাকা উঁচু করে তুলে ধরেছেন। দুই

কীর্তিমানের অসাধারণ অ্যাকাদেমি থেকে বেরিয়ে এসেছে সাইনা নেওয়াল, পি ভি সিন্ধু, কিদাম্বি শ্রীকান্ত, এইচ এস প্রণয়, সাইপ্রণীত-সহ অসংখ্য উঁচুমানের খেলোয়াড়। বিশ্বের প্রতিটি প্রথম সারির টুর্নামেন্টে কোনো না কোনো ভারতীয় খেলোয়াড় ফাইনালে উঠছেন এমনকী চ্যাম্পিয়নও হয়েছেন কেউ না কেউ। এর মধ্যে রয়েছে এশিয়াডে সাইনা নেহাওয়ালের ব্রোঞ্জ এবং অলিম্পিকে পি ভি সিন্ধুর রৌপ্য পদক জয়। চীন, দক্ষিণ কোরিয়া, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, জার্মান, ডেনমার্ক, ইংল্যান্ড প্রতিটি উন্নত দেশই আজ ভারতের উত্থানে সন্ত্রস্ত। প্রকাশ, গোপীচাঁদের হাত ধরে ভারতীয় ব্যাডমিন্টনের নবোদয় ঘটেছে।

রমানাথন কৃষ্ণন যে উজ্জ্বল পরম্পরার সূচনা করেছিলেন তাকে বর্ণময় ও গতিশীল করে তুলেছেন বিজয় ও আনন্দ অমৃতরাজ, রমেশ কৃষ্ণন, লিয়েন্ডার পেজ, মহেশ ভূপতি, সানিয়া মির্জারা। টেনিস দুনিয়ার সবচেয়ে কঠিন প্রতিদ্বন্দ্বিতার খেলা। জনপ্রিয়তা ও সামাজিক গুরুত্বে এক নম্বর ইভেন্টের স্বীকৃতি পেয়েছে। এহেন এক বিশ্বজনীন খেলায় ভারতীয়রা গ্রান্ডস্লাম টুর্নামেন্ট জিতছেন, যা দূরতম কল্পনাতেও ভাবা সম্ভব ছিল না গত শতাব্দীতে। লিয়েন্ডার, মহেশ, সানিয়ারা সেটাই করে দেখিয়েছেন। তিন ভারতীয় মিলে পুরুষ ও মিক্সড ডাবলস জুটিতে গ্রান্ডস্লাম খেতাব জিতেছেন। এছাড়া বিদেশি পার্টনারদের নিয়ে আরও বহু সংখ্যক গ্রান্ডস্লামে নিজেদের নাম খোদাই করেছেন। ডেভিস কাপে ভারত তিনবার ফাইনালে উঠেছে। রমানাথনের সময়ে একবার আর বিজয় অমৃতরাজের নেতৃত্বে আরও দুবার। ভাগ্য সহায় থাকলে টেনিসের বিশ্বকাপও করায়ত্ত হোত ভারতীয়দের। রমানাথন একমাত্র ভারতীয় যিনি সিঙ্গলসে উইমবলডনের শেষ চারে উঠেছিলেন একাধিকবার। এছাড়া বেশ কয়েকটি আন্তর্জাতিক ওপেন টুর্নামেন্ট জিতেছেন। একই কথা প্রযোজ্য বিজয় অমৃতরাজের ক্ষেত্রে। গ্রান্ডস্লাম জিততে না পারলেও এটিপি সার্কিটে বড় মাপের বহু টুর্নামেন্ট জিতে নিয়েছেন। লিয়েন্ডার পেজ জিতেছেন আটলান্টা অলিম্পিকে ব্রোঞ্জ। সব মিলিয়ে বিশ্ব টেনিসে ভারত বিগত ৫০-৬০ বছর ধরে একটা সম্মানজনক অবস্থানে বিরাজ করছে।

এই শতাব্দীতে শ্যুটিং, কুস্তি, বক্সিংয়ের মতো খেলাগুলিতেও ভারতীয়রা বিক্ষিপ্তভাবে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে জাত চিনিয়েছেন। যশপাল রানা, রাজ্য বর্ধন সিংহ রাঠোর, সমরেশ জং, বিজয় কুমাররা শ্যুটিংয়ে বিশ্বের সর্বোচ্চ মঞ্চে দাপট দেখিয়ে পদক জিততে সক্ষম হয়েছেন। কুস্তির সুশীল কুমার, বক্সিংয়ে বিজেন্দ্র সিং সাম্প্রতিককালে যে উচ্চতায় উঠেছেন এই অনুন্নত সিস্টেমের মধ্যে থেকে তারজন্য কোনো প্রশংসাই যথেষ্ট নয়। বিশ্বমানচিত্রে জ্বলজ্বল করছেন সুশীল, বিজেন্দ্ররা। বিজেন্দ্র এখন পেশাদার বক্সিং সার্কিটে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। এ যাবৎ প্রতিটি রাউন্ডেই শক্তিশালী বিদেশি প্রতিপক্ষকে নকআউট করে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হবার লক্ষ্যে এগিয়ে চলেছেন। মেরি কম অ্যামেচার বক্সিংয়ে পাঁচবার বিশ্ব খেতাব জিতেছেন যা চোখ কপালে তুলে দেওয়ার মতো ঘটনা। এদেশের নারীকূলের সামনে মূর্তিমান আদর্শ মেরি কম।

দলগত স্তরে হকিই একমাত্র খেলা যে খেলায় ভারত দীর্ঘকাল যাবৎ বিশ্বপর্যায়ে একাধিপত্য দেখিয়ে নিজের সাম্রাজ্য অটুট রাখতে পেরেছে। প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের প্রতিটি উন্নত হকি খেলিয়ে দেশ ভারতের টেকনিক ও স্কিলকে আয়ত্ত করেছে নিজের ঘরানার সঙ্গে। আর ভারতের সামনে বড়সড় চ্যালেঞ্জ মেলে ধরেছে। তিনদশক ধরে ভারত বৃহত্তর আন্তর্জাতিক সার্কিটে কোনো বলার মতো সাফল্য পায়নি। যা কিছু সাফল্য ও গৌরব কেবলমাত্র এশিয় পর্যায়ে। তবে আশার কথা নতুন শতকে জুনিয়র পর্যায়ে ভারত বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হয়েছে। গত বছরও বিশ্বযুব খেতাব এসেছে ভারতে। এই যুব দলটাকে ঠিকমতো পরিচর্যা করতে পারলে বিশ্ব সার্কিটে হৃতগৌরব পুনরুদ্ধার হতে পারে। নিয়মিত বিদেশে টুর্নামেন্ট খেলার সুযোগ এবং আর্থিক ও ব্যবহারিক সমস্তরকম সুযোগ সুবিধে পেলে ভারতীয় যুব দলটিই পারবে তিন দশকের অন্ধকার কাটিয়ে নবোদিত সূর্যের আলোয় উজ্জ্বল দিকচক্রবাল রচনা করতে। হকির মতোই আর একটি খেলায় ভারত দুনিয়া জুড়ে আধিপত্য বিস্তার করে এখনো তা ধরে রাখতে পেরেছে। বিলিয়ার্ডস ও স্নুকার ব্রিটিশ কমনওয়েলথ গেমস হলেও কমলওয়েলথের বাইরে বহু দেশ চর্চা করছে। মাইকেল পেরেরা, গীতশেঠী, পঙ্কজ আডবানীরা একের পর এক বিশ্বখেতাব জিতে ব্রিটিশ অভিজাত খেলাটির যথার্থ ভারতীয়করণ করে দিয়েছেন। পঙ্কজ আডবানী বিলিয়ার্ডস ও স্নুকার মিলিয়ে সব পর্যায়ের ফরম্যাটে ১৫ বার বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হয়ে 'গিনস বুক অব রেকর্ডসে' নিজের ও দেশের নাম খোদাই করেছেন।

সব শেষে বলতে হয় ভারতীয় ক্রিকেটের কথা। স্বাধীনোত্তর কালে অন্যতম সেরা প্রাপ্তি ভারতীয় দলের তিনবার বিশ্বজয়। দু'বার ৫০ ওভারের ম্যাচে, ১৯৮৩ এবং ২০১১ সালে। একবার কুড়ি ওভারের ম্যাচে। সম্প্রতি ভারতের মেয়েরাও বিশ্বকাপে রানার আপ হয়েছেন। সব মিলিয়ে বলা যেতে পারে সত্তর বছরে ভারত ক্রীড়াবিশ্বে নতুন শক্তিরূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছে। এই প্রতিষ্ঠাকে ফুলে ফলে ভরিয়ে তোলার দায়িত্ব আধুনিক প্রজন্মের। ■

স্বাধীন ভারতের অভিশাপ : নেহরু পরিবারতন্ত্র

অভিমন্যু গুহ

২০০৯ সালে সাংবাদিক কাঞ্চন চন্দ্র ও দুই রাষ্ট্রবিজ্ঞানী অঞ্জলি ভোলকেন ও সিমন চৌচার্ড মিলে একটি সমীক্ষা চালান। তাঁদের বিষয় ছিল একবিংশ শতাব্দীতে ভারতীয় রাজনীতিতে পরিবারতন্ত্রের প্রভাব। ওই বছর ছিল লোকসভা নির্বাচন। কংগ্রেস দ্বিতীয় ইউপিএ সরকার গঠনের মাধ্যমে ক্ষমতায় আসে। এঁদের গবেষণায় দেখা গিয়েছিল, ভারতে একটি মাত্র পরিবারের ক্ষমতাই তখন অপ্রতিহত এবং সেটি অবশ্যই নেহরু পরিবার। আনুষ্ঠানিকভাবে ক্ষমতায় না থাকলেও সোনিয়া গান্ধী ও রাহুল গান্ধীই প্রকৃত ক্ষমতার অধিকারী, শুধু তাই নয় এদের অঙ্গুলি হেলন ছাড়া সরকারের যে একটি পাতাও নড়ে না, তা ওই গবেষণায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

তবে ২০১৪ সালে এই গবেষণার ফলটি চমকপ্রদ। এঁদের তথ্যে দেখা গিয়েছিল মোট সংসদ-সদস্যের ২২ শতাংশ সাংসদেরই নির্বাচনে জয়লাভের পেছনে রয়েছে পারিবারিক প্রভাব। এবং অবশ্যই এক্ষেত্রে অগ্রণী রাজনৈতিক দলের নামটি কংগ্রেস। কিন্তু লক্ষণীয় শুধু নেহরু পরিবারের মধ্যেই বিষয়টি আবদ্ধ থাকেনি। দলের নির্বাচিত সাংসদদের মধ্যে ৪৮ শতাংশেরই পারিবারিক প্রভাব রয়েছে। পারিবারিক প্রভাব বলতে বুঝতে হবে কোনো সাংসদের খুব নিকট সম্বন্ধীয় আত্মীয় স্বজন সক্রিয় রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত কিংবা নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি।

একথা ঠিক যে বর্তমানে ভারতীয় রাজনীতির যে অবস্থা তাতে পরিবারতন্ত্রের একচেটিয়া আধিপত্যের বিষয়টি অনস্বীকার্য। উত্তর প্রদেশে মুলায়ম পরিবার, বিহারে লালুর পরিবার, পঞ্জাবে বাদল পরিবার, মহারাষ্ট্রে ঠাকরে কিংবা পাওয়ার পরিবারের একচ্ছত্র আধিপত্য কায়েম রয়েছে। এঁদের মধ্যে অনেকেই জনগণের দ্বারা প্রত্যাখ্যাত, কিন্তু দলীয় স্তরে এঁরাই সর্বেসর্বা। যেমন উত্তরপ্রদেশে মুলায়ম-অখিলেশের কথা সবারই জানা। কাঞ্চন-অঞ্জলি-সিমনের গবেষণায় দেখা গেছে যে বিজেপির নির্বাচিত সাংসদদের ১৫ শতাংশও পারিবারিক প্রভাবযুক্ত। কিন্তু এই তথ্য কেউ দেখাতে পারেনি যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী কিংবা বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি অমিত শাহের পরিবারের কেউ কখনও কোনোদিনও কোনো রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

যোগ্যতা থাকলে কোনো নেতা-নেত্রী, সাংসদ-বিধায়কের ছেলে-মেয়ে ভাইপো-ভাইঝি রাজনৈতিক নেতৃত্ব গ্রহণ করতেই পারেন। যেখানে ভারতের রাজনীতির ক্ষেত্রটি উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবে ছোটো করে দেওয়া হয়েছে, সেখানে নেতা-মন্ত্রীর পুত্র-কন্যার যোগ্যতা থাকলে তাঁকে নেতৃত্ব দানের অধিকার থেকে বঞ্চিত করার যুক্তি হয় না। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর ভাইপো অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় আজ তৃণমূলের নেতা, ডায়মন্ডহারবার থেকে তাঁকে ২০১৪ সালে মমতা সাংসদ করবার আগে কতজন চিনতেন? যোগ্যতা বিষয়টি প্রমাণসাপেক্ষ, কিন্তু স্বজনপোষণের নীতি স্বাধীনোত্তর ভারতের রাজনীতিকে যে ক্রমশ সাধারণের থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে তাতে সন্দেহ নেই।

অথচ মোদী-অমিত শাহের সঙ্গে রাজনীতির ন্যূনতম পারিবারিক যোগও নেই, এতে এঁদের দলীয় বা সরকারি সিদ্ধান্ত অনেক স্বচ্ছ; দেশের দরিদ্রতম মানুষ কিংবা দলের সামান্যতম কর্মীও দেশ ও দলের সঙ্গে একাত্ম হতে পারছেন শুধুমাত্র এই কারণেই। এঁদের মধ্যে স্বজন

পোষণের কোনও কালিমা নেই। দেশ ও দলের প্রকৃত নেতা হিসেবে এঁরা এঁদের স্থানটি বজায় রাখতে পেরেছেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হলো, দেশের স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ের অধিকাংশ সময় একটি বিশেষ পরিবারের হাতে দেশ ও একটি দলের ক্ষমতা কায়েম থাকায় ভারতীয় রাজনীতিতে স্বজনপোষণের ছায়া পড়েছে। সর্বোচ্চ নেতৃত্ব পোষণে উৎসাহিত হলে তার প্রভাব নীচুতলাতেও ছড়িয়ে পড়ে।

নেহরুর এদেশের প্রধানমন্ত্রী হওয়াটা নেহাতই পাকেচক্রে। ভারতের মানুষের স্বাধীনতার দাবিকে স্বীকৃতি জানাতে হবে বুঝেই ষড়যন্ত্রের ছক বানিয়ে ফেলেছিল ব্রিটিশরা। তাদের খুব কাছের লোক ছিল জওহরলাল। দ্বি-জাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে ভারতবর্ষকে টুকরো তো করা হয়েইছিল কিন্তু ইংরেজদের নেতাজী সুভাষ-ভীতি তখনও যায়নি। তাই সবদিক দিয়েই জওহরলাল ছিল তাদের পছন্দের প্রার্থী। সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল যতদিন জীবিত ছিলেন ততদিন নেহরুর বিশেষ কার্যকারিতা ছিল না। কিন্তু দেশের স্বাধীনতার আড়াই-তিন বছরের মধ্যে প্যাটেলের মৃত্যু নেহরুর সামনে কায়েমি শাসনব্যবস্থা পাকা করার রাস্তা খুলে দেয়।

নেহরুর মৃত্যুর পর অল্প কিছুদিনের জন্য লালবাহাদুর শাস্ত্রী প্রধানমন্ত্রী হলেন। লালবাহাদুর আরও কিছুদিন বেঁচে থাকলে ভারতের ইতিহাস হয়তো অন্য খাতে প্রবাহিত হোত। কিন্তু এক্ষেত্রে নেহরু কন্যা ইন্দিরারও বাবার মতোই চওড়া কপাল। ১৯৬৬ সালে শাস্ত্রীর রহস্য মৃত্যুর সুযোগ নিয়ে তিনি যেন বাবার ছেড়ে যাওয়া আসনে বসলেন। এরপরই শুরু হলো ভারতে পরিবারতন্ত্রের কালিমালিপ্ত ইতিহাস।

অদ্ভুত এই পরিবারতন্ত্র। পরিবারের 'উত্তরাধিকার' মনোনয়ন প্রক্রিয়াটিও বেশ চমকপ্রদ। ইন্দিরা যেমন বেছেছিলেন তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র সঞ্জয়কে। জরুরি অবস্থার সময় সঞ্জয়ই ছিল তাঁর যাবতীয় কুকীর্তির মদতদাতা। কিন্তু একসময় এই একচ্ছত্র অধিপতিটিরই প্রয়োজন ফুরলো ইন্দিরার কাছে। সঞ্জয় দুর্ঘটনায় মারা গেলে ইন্দিরা মনোনয়ন করলেন তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র, পেশায় পাইলট রাজীবকে।

তাই ১৯৮৪ সালে নিজের নিরাপত্তারক্ষীর হাতে ইন্দিরার মৃত্যু ঘটলে রাজীব রাতারাতি প্রধানমন্ত্রী হলেন। শোনা যায়, প্রণব মুখোপাধ্যায় তখন মন্ত্রীসভার দ্বিতীয় ব্যক্তি হিসেবে প্রধানমন্ত্রী হওয়ার বাসনা প্রকাশ করায় তাঁর সাময়িক নির্বাসন হয়েছিল রাজনীতি থেকেই। রাজীবের বিস্ফোরণে মৃত্যু ঘটলে পরে নরসিমা রাও প্রধানমন্ত্রী হলেও ক্ষমতার রাশ রাজীবপত্নী সোনিয়ার হাতেই ছিল। আর মনমোহন তো তাঁর হাতের পুতুলই ছিলেন, একথা সবারই জানা।

সোনিয়া-রাজীবের কন্যা প্রিয়াঙ্কার মধ্যে তবু অনেকে ইন্দিরার ছায়া দেখেছিলেন কিন্তু এবারও দেখা গেল পারিবারিক মনোনয়ন রাহুলের দিকে। তাই প্রিয়াঙ্কা ব্রাত্য। এই যে পরিবারতান্ত্রিক মানসিকতা, পারিবারিক পছন্দ-অপছন্দের ওপর ভারতবর্ষের রাজনীতির নির্ভরতা তাকে পরিহার করবার সময় এসেছে। এবং ভারতবর্ষের মানুষ তা করতে পেরেছেন বলেই কংগ্রেসের আজ হাঁড়ির হাল হয়েছে, অন্যের ভরসায় অনেকটা প্যারাসাইটের ভূমিকা পালন করছে এককালের দোর্দণ্ডপ্রতাপ রাজনৈতিক দলটি। আজ যখন দেশের রাষ্ট্রপতি থেকে উপরাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী থেকে লোকসভার অধ্যক্ষ অবধি জাতীয়তাবাদী পাঠশালার মানুষ, তখন বিজাতীয় ভাবধারায় বিশ্বাসী নেহরুর নাম কেন সর্বত্র উল্লিখিত হচ্ছে না, এই নিয়ে কংগ্রেসিদের ক্ষোভ দেখলে মনে হয়— পরিবারতন্ত্রের কুফল দেশবাসী যতই ভোগ করুন না কেন, একটি রাজনৈতিক দলের অন্তত প্রাণভোমরা ছিল সেই পরিবারতন্ত্র। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে, যে পরিবারের ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে কানাকড়িও ভূমিকা ছিল না তারাই স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে কংগ্রেসকে কুক্ষিগত করে আছে।

মহান স্বাধীনতা-সংগ্রামী বানানোর টোপ আর ভারতবাসী গিলছেন না। এখন তো তারা আবার 'ইয়ে আজাদী ঝুটা হ্যায়'-এর দোসর। সুতরাং এদের স্বরূপ চিনতে দেশবাসীর দেরি হয়নি। ■

১৫ই আগস্ট
বিশেষ সংখ্যা

চারজন রাষ্ট্রনায়কের মৃত্যু স্বাধীন ভারতেও রহস্যাবৃত

সন্দীপ চক্রবর্তী

লালবাহাদুর শাস্ত্রীর মরদেহের পাশে তাঁর স্ত্রী ললিতা শাস্ত্রী।

১৯৪৫ সালের ১৮ আগস্ট। এইদিন একটি খবর সারা ভারতবর্ষকে স্তব্ধ করে দিয়েছিল। খবরটি নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর তথাকথিত বিমান দুর্ঘটনার। তথাকথিত কারণ পরবর্তীকালে গঠিত কোনও তদন্ত কমিটিই এই ঘটনার সত্যতা প্রমাণ করতে পারেনি। এমনকী দুর্ঘটনার পর নেতাজীর মৃতদেহ বা দেহাবশেষ কেন পাওয়া গেল না তারও কোনও সদুত্তর দিতে পারেনি। আজাদ হিন্দ বাহিনীর আরও বেশ কয়েকজন লেফটেন্যান্ট, যাঁরা পরের বিমানে নেতাজীর উদ্দেশে রওনা হয়েছিলেন, তাঁরা কেউ তাদের সর্বাধিনায়কের মৃতদেহ দেখেননি। নেতাজীর নামে কোনও ডেথ সার্টিফিকেটও ইস্যু করা হয়নি। তাহলে কী হয়েছিল তাঁর? এ ব্যাপারে প্রত্যক্ষ প্রমাণ বিশেষ কিছু না থাকলেও কয়েকজন প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষ্য রয়েছে, যা এক সুগভীর চক্রান্তের দিকে ইঙ্গিত করে। সোভিয়েত ইউনিয়নে ভারতের প্রথম রাষ্ট্রদূত ছিলেন বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত। তারপর ড. রাধাকৃষ্ণন রাষ্ট্রদূত হন। তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ড. সরোজ দাসকে একবার বলেছিলেন নেতাজী রাশিয়ায় আছেন। একই কথা শোনা গিয়েছিল আরেক রাষ্ট্রদূত ড. সত্যনারায়ণ সিনহার মুখেও। তিনি শুনেছিলেন সিপিআই-এর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা অবনী মুখোপাধ্যায়ের ছেলে জর্জির কাছে। তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী নেতাজী এবং অবনী মুখোপাধ্যায় সাইবেরিয়ার জেলে পাশাপাশি প্রকোষ্ঠে বন্দি ছিলেন। সোভিয়েত নেতা নিকিতা ক্রুশ্চেভও একবার বলেছিলেন ভারত সরকার চাইলে সোভিয়েত ইউনিয়ন পঁয়তাল্লিশ দিনের মধ্যে নেতাজীকে ভারতের হাতে তুলে দেবে। অর্থাৎ ভারত সরকার চায়নি। তখন ভারতের প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু। সুভাষ বোস দেশে ফিরে এলে 'কংগ্রেস দেশকে স্বাধীন করেছে'— এই মিথ্যা প্রবল জনমতের চাপে ভেঙে পড়ত বলে মনে করেন অনেক ঐতিহাসিক। ড. সুব্রহ্মনিয়াম স্বামী সম্প্রতি বলেছেন, 'আমাদের কাছে যা তথ্য আছে তাতে স্পষ্ট, নেতাজী নিজের মিথ্যে মৃত্যুসংবাদ ছড়িয়ে দিয়ে মাঞ্চুরিয়ায় চলে গিয়েছিলেন। মাঞ্চুরিয়া তখন ছিল রাশিয়ার দখলে। স্তালিন তাঁকে সাইবেরিয়ার কারাগারে বন্দি করে রাখেন। ১৯৫৩ সাল নাগাদ হয় তাঁকে ফাঁসি দেওয়া হয় নয়তো অন্য কোনও উপায়ে শ্বাসরোধ করে হত্যা করা হয়।'

নেহরুর ষড়যন্ত্রের দ্বিতীয় শিকার ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। এবার তাঁর সহযোগী জম্মু-কাশ্মীরের তখনকার মুখ্যমন্ত্রী শেখ আবদুল্লা। এ ব্যাপারে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ী সরাসরি নেহরুকে দায়ী করেছেন।

কাশ্মীরে সংবিধানের ৩৭০ ধারা লাগু হবার পর দেশে 'এক নিশান, এক বিধান, এক প্রধান' নীতির প্রবক্তা ড. শ্যামাপ্রসাদ সেখানে গিয়েছিলেন একটি অনশন আন্দোলনে অংশ নেওয়ার জন্য। ১১ মে ১৯৫৩ কাশ্মীরে পা রাখার সঙ্গে সঙ্গে শেখ আবদুল্লার পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করে। তাঁর স্থান হয় জেলখানায়। শ্যামাপ্রসাদ অসুস্থ হয়ে পড়ায় গ্রেপ্তারির দেড় মাস পর তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এরপর তাঁকে একটি ইঞ্জেকশন দেওয়া হয়েছিল। হাসপাতালের রেজিস্টারে পেনিসিলিন ইঞ্জেকশন বলে উল্লেখ করা হলেও ইঞ্জেকশন নেওয়ার অব্যবহিত পর থেকেই শ্যামাপ্রসাদের শারীরিক অবস্থার ক্রমিক অবনতি ভাবতে বাধ্য করে তা আদৌ পেনিসিলিন ছিল কিনা! ২৩ মে ১৯৫৩ শ্যামাপ্রসাদ মারা যান। স্বাভাবিক ভাবেই দেশজুড়ে তীব্র প্রতিক্রিয়া হয়েছিল। সন্দেহের তির নেহরুর দিকেই। কারণ শ্যামাপ্রসাদের মৃত্যুতে লাভ দু'জনের— নেহরুর এবং শেখ আবদুল্লার। তাই শ্যামাপ্রসাদের জননী যোগমায়া দেবীর নিরপেক্ষ তদন্তের দাবিতেও কর্ণপাত

রেললাইনে দীনদয়াল উপাধ্যায়ের মরদেহ।

করেননি নেহরু। কিন্তু পরবর্তীকালে শেখ আবদুল্লা বলেছিলেন, ‘শ্যামাপ্রসাদের মৃত্যুর জন্য শুধু আমি একা দায়ী নই। আরও বড় মাথা এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে।’ সেই মাথা কার সেদিনও কারও বুঝতে অসুবিধে হয়নি, আজও হয় না।

এরপর ভারতের দ্বিতীয় প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রী। স্বামীর মৃতদেহ দেখে চমকে উঠে উঠেছিলেন ললিতা শাস্ত্রী। সারা দেশকে স্তব্ধ দিয়েছিলেন তাঁর সকরুণ কণ্ঠস্বর, ‘ওঁর শরীরটা এমন নীল হয়ে গেল কী করে!’ শুধু কী শরীরের রঙ, পাকস্থলীর আশেপাশেও পাওয়া গেল কাটাছেড়ার দাগ। অথচ বলা হয়েছিল হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে লালবাহাদুর শাস্ত্রী পরলোকগমন করেছেন। তাতে তো এরকম হওয়ার কথা নয়। তাঁর পরিবার এখনও বিশ্বাস করে বিষ প্রয়োগ করে তাঁকে হত্যা করা হয়েছিল। কিন্তু কীসের জন্য? ১৯৬৫ সাল। পাকিস্তান অন্যায়ভাবে কাশ্মীরের কয়েকটি জায়গা দখল করে বসল। যুদ্ধ ঘোষণা করল ভারত। যুদ্ধ হয়েছিল হাজি পির, আসাল উত্তর, বারকি, ভোগরি এবং ফিল্লোরায়। বাইশ দিনের যুদ্ধে প্যাটন ট্যাঙ্ক নিয়ে আস্ফালনরত পাকিস্তানকে ধুলো চাটিয়ে ছেড়েছিল ভারত। পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আয়ুব খান রাষ্ট্রপুঞ্জের সাহায্য চাইলেন। রাশিয়া এবং আমেরিকার চাপে লালবাহাদুর যুদ্ধ বন্ধ করতে বাধ্য হলেন। স্থির হলো, সোভিয়েত নেতা কিসিঙ্গারের মধ্যস্থতায় ভারত ও পাকিস্তান শান্তিচুক্তি করবে। যেসব পাক-অঞ্চল ভারতীয় সেনা অধিকার করেছিল সেসব ফিরিয়ে দিতে হলো। বলা হয়, যুদ্ধে ভারত যা জিতেছিল তার সবই খোওয়া গিয়েছিল তাসখন্দে। চুক্তি সম্পাদন করে ক্লান্ত-বিধ্বস্ত লালবাহাদুর ফিরে এসেছিলেন নিজের ঘরে। মেয়ে সুমনকে ফোনে বলেছিলেন, রাতে এক গ্লাস দুধ ছাড়া আর কিছুই খাবেন না। সেই দুধেই কি মেশানো হয়েছিল বিষ? তার থেকেও বড় প্রশ্ন কে মেশাল? সোভিয়েত ইউনিয়ন, আমেরিকা নাকি নেহরু-তনয়া ইন্দিরা? একটা যুদ্ধ করেই লালবাহাদুর বুঝিয়ে দিয়েছিলেন বিশ্বজুড়ে ঝুটা শক্তিসাম্যের পরোয়া তিনি করেন না। গুটিকয়েক দেশ ক্রমাগত শক্তিশালী হবে এবং অন্য দেশগুলি তাদের মোসাহেবি করবে— এই দ্বিচারিতা চলতে দেওয়া উচিত নয়। এদিকে ইন্দিরাও বুঝতে পারছিলেন লালবাহাদুর বেশিদিন প্রধানমন্ত্রী পদে থাকলে ক্ষমতার রাশ ধীরে ধীরে নেহরু পরিবারের হাত থেকে বেরিয়ে যাবে।

১৫ই আগস্ট
বিশেষ সংখ্যা

অর্থাৎ মোটিভ তাঁরও ছিল। এখন এদের মধ্যে প্রকৃত হত্যাকারী কে তা সময়ই বলবে।

১৯৬৮ সালের ১১ মে। সময় দুপুর তিনটে পঁয়তাল্লিশ। মুঘলসরাই স্টেশনের লিভারম্যান দেখতে পেলেন এক ব্যক্তি লাইনের ধারে পড়ে আছেন। পরীক্ষা করার পর রেলের চিকিৎসক তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করলেন। তাঁর নাম পরিচয় সবই তখন অজানা। মৃতদেহটি স্টেশনে আনার পর একদল মানুষ তাকে ঘিরে ফেললেন। তাদেরই মধ্যে একজন চিৎকার করে বললেন, ‘ইনি ভারতীয় জনসঙ্ঘের প্রেসিডেন্ট পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়।’

ভাবা যায়, নিজের সময়ের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দার্শনিক, ঐতিহাসিক সাংবাদিক— সর্বোপরি রাজনীতিবিদ, রেলইয়ার্ডের ধারে মৃত অবস্থায় পড়ে আছেন! শক্ত হয়ে যাওয়া মুঠোয় একটা পাঁচ টাকার নোট। তিনি আত্মহত্যা করার মানুষ নন। তাহলে কীভাবে মৃত্যু হলো? বডির পজিশন দেখে পুলিশ অনুমান করেছিল তাঁকে ট্রেন থেকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু কেন? পুলিশ প্রশাসন সবাই নিরুত্তর। আজও এই রহস্যের সমাধান হয়নি। দীনদয়াল উপাধ্যায় ছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের স্বয়ংসেবক। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ীর পূর্বসূরি। ভারতবর্ষে কংগ্রেসি রাজনীতির উল্টোদিকে অবস্থান জাতীয়তাবোধের ধারক ও বাহক রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের। জাতীয়তাবোধে দীক্ষিত এক দেশসেবক। দেশের হিন্দুশক্তির পুনরুজ্জীবনের জন্য তিনি কাজ করছিলেন। যে কাজ সম্পূর্ণ হলে কংগ্রেসের তোষণবাদী রাজনীতির ভিত পর্যন্ত টলে যাবে।

তাই তাঁর মৃত্যুতে শোকাহত সঙ্ঘের তৎকালীন সরসঙ্ঘচালক শ্রীগুরুজী বলেছিলেন, ‘এই মৃত্যুর তদন্ত হওয়া প্রয়োজন। সত্য যাই হোক, মানুষ তা জানতে চায়।’ তিনি বুঝেছিলেন এই মৃত্যু স্বাভাবিক নয়। কিন্তু ক্ষমতায় অন্ধ কংগ্রেস সরকার তাঁর কথায় কর্ণপাত করেনি। দীনদয়াল উপাধ্যায়ের মৃত্যু থেকে গেছে রহস্যের অন্তরালে। ■

১৫ই আগস্ট বিশেষ সংখ্যা

অনুপ্রবেশকারী বিতাড়ন ছাড়া আমাদের স্বাধীনতা রক্ষা সম্ভব নয়

মোহিত রায়

স্বাধীনতার ৭০ বছর পর আমাদের আবার স্বাধীনতা রক্ষার কথা ভাবতে হচ্ছে। ৭০ বছরের তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষতার ফলে আমাদের স্বাধীনতা আজ সত্যিই বিপন্ন। এটা কোনো তাত্ত্বিক কথা বা ভাবাবেগের কথা নয়, একেবারে বাস্তবের মাটিতেই ভারতের বিভিন্ন স্থানে এই স্বাধীনতাকে বিপন্ন করা হচ্ছে রোজ। প্রথমেই আসে জম্মু-কাশ্মীরের কথা। এই রাজ্যটির জন্য যে বিশেষ ৩৭০ ধারাটি রয়েছে, যে ধারাটির জন্য ৭০ বছর পরেও জম্মু-কাশ্মীর ভারতীয় সংবিধান ও আইনের পুরো আওতায় আসেনি, সে ধারাটি যে শুরুতেই একটি সাময়িক ব্যবস্থা বলে দেওয়া হয়েছিল তা প্রায় উচ্চারিত হয় না। ৭০ বছর ধরে মূলত কংগ্রেসি শাসন কাশ্মীরকে স্বাধীন ভারতের পুরোপুরি একটি রাজ্য হতে দেয়নি। উত্তর কেরলে বিভিন্ন স্থানে এখন ভারতীয় আইন চলে না, শরিয়তি শাসন চালু হয়ে গেছে। সেখানে দু'একটি মুসলমান দল একেবারে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে সামরিক বাহিনীর মতো প্যারেড করে। হায়দরাবাদে একটি রাজাকার-ভিত্তিক দল হুমকি দিয়েই যায়। আর অসম ও পশ্চিমবঙ্গে বিপুল বাংলাদেশি মুসলমান অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে, রাজ্যদুটির জনমানচিত্র বদলে দিয়ে বাংলাদেশের অঙ্গ বানানোর কাজ চলছে। অসম ও পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থানে এখন শরিয়তি শাসনই বাস্তব।

কাশ্মীরে মাঝে মাঝেই জঙ্গি হানা, কাশ্মীর-সহ দেশের বিভিন্ন স্থানে জঙ্গিদের বিস্ফোরণ দাঙ্গার ঘটনা ঘটলেই দীর্ঘকাল ধরে আমাদের নেতাদের, এমনকী বিজেপির শীর্ষ নেতাদের একটাই বয়ান ছিল যে এসব পাকিস্তানের কাজ। আগের এনডিএ জমানায় প্রধানমন্ত্রী স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কিছু ঘটলেই সব দায় চাপাতেন পাকিস্তানের উপর। কংগ্রেসিদের কথা বাদ দিলাম কারণ জঙ্গি ঘটনার অর্ধেকের ব্যাপারে তারা জঙ্গিদের সঙ্গেই থাকে। এমনকী মুম্বইয়ে জঙ্গি হামলার পর তা আসলে হিন্দুদের কাজ বলেই যে বই লেখা হয় তার প্রকাশ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে তা সমর্থন করেন কংগ্রেসের শীর্ষ নেতা দিগ্বিজয় সিংহ। সুতরাং কংগ্রেসের কথা বাদ দেওয়া যেতে

পারে কিন্তু আমরাও পাকিস্তানের উপর সব দোষ চাপিয়ে চুপ করে থাকি। এমনকী আমাদের নেতারা বিদেশে গিয়ে বলে আসেন যে সারা পৃথিবীতে বিভিন্ন দেশের মুসলমানরা আই এস বা আল কায়দায় যোগ দিচ্ছে কিন্তু ভারতীয় মুসলমানরা তাতে নেই।

যে কথাটা বলতে চাইছি আমাদের নেতারা, বিজেপি নেতারাও, বলতে ভুলে যান যে আমাদের ইসলামি জঙ্গি হানার মূল উৎস সীমান্তের ওপারের পাকিস্তান নয়, ভারতের মধ্যে তৈরি হওয়া অনেক ছোট বড় পাকিস্তান। মুম্বই শহরে অনেক পাকিস্তান আছে বলেই সেখানে দাউদ ইব্রাহিম তৈরি হয়, এমনকী সে দেশ ছেড়ে চলে গেলেও তার পরিবারের অন্যরা তাদের কাজকর্ম ভালভাবেই চালিয়ে যায়। মুম্বই ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির পাকিস্তান সমর্থকরা একের পর এক ভারত-বিরোধী ছবি বানায়। সঞ্জয় দত্তের মতো একজন দাউদ সঙ্গী এখনো চিত্রতারকার মর্যাদা পায়। দিল্লি মহানগর দীর্ঘদিন ধরে বিজেপির ঘাঁটি। কখনো দিল্লি সরকার, কখনো কেন্দ্রীয় সরকার। এখনো দিল্লি পুরসভা বিজেপির হাতে রয়েছে। অথচ দিল্লি মহানগরে যত লোক বাংলাভাষায় কথা বলে তার অর্ধেক বাংলাদেশি। দেশের রাজধানীতে কয়েক লক্ষ বাংলাদেশি মুসলমান বসে আছে কিন্তু আজ পর্যন্ত তাদের সেখান থেকে বিতাড়নের কোনো প্রচেষ্টাই কেউ করেনি, বিজেপিও নয়। এরাই বানিয়ে রেখেছে ছোট ছোট পাকিস্তান। তাছাড়া ভারতীয় মুসলমানদের একাংশও বানিয়ে রেখেছে ছোট ছোট পাকিস্তান যেমন উত্তরপ্রদেশের আজমগড়। এই পাকিস্তানগুলিকে নিয়ে কোনো ব্যবস্থা নেবার কোনো প্রচেষ্টা না নিলে সীমান্তের ওপারের পাকিস্তান বা বাংলাদেশের সঙ্গে কোনো যুদ্ধই জেতা যাবে না। আমাদের স্বাধীনতা অটুট রাখার সবচেয়ে বড় রক্ষাকবচ হলো দেশের ভিতরের পাকিস্তানগুলিকে ধ্বংস করা।

পশ্চিমবঙ্গের কথায় আসি। পশ্চিমবঙ্গ এখন স্রেফ তার অস্তিত্বের শেষ পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে হিন্দুদের অস্তিত্ব থাকবে কী থাকবে না এখনই ঠিক হবার সময় এসে গেছে। পশ্চিমবঙ্গ তৈরি হয়েছিল বাঙালি হিন্দুদের নিরাপদ বসবাসের জন্য আজ তা শেষ হয়ে গেছে। আজ পশ্চিমবঙ্গের একটি বড় অংশে মুসলমানরা যে কোনো সময় তাদের ইচ্ছেমতন হিন্দুদের উপর আক্রমণ করতে পারে, এমনকী সেখানে তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠ হবারও দরকার নেই। মুর্শিদাবাদ বা মালদহ জেলা এখন মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ জেলা। সেখানে বহু অংশেই এখন চলে শরিয়তি নিয়ম কানুন। একইরকম অবস্থা উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনার মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলে। এগুলি হয়ে রয়েছে এক একটি ছোট পাকিস্তান। এমনকী ধুলাগড় বা ক্যানিংয়ে মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ না হলেও হিন্দুদের উপর আক্রমণ চালাতে পারে, কারণ তারা জানে যে তৃণমূল সরকারের পুলিশ তাদের সঙ্গে আছে। পশ্চিমবঙ্গ এখন পশ্চিম বাংলাদেশ হবার অপেক্ষায়। বাংলার দুই তৃতীয়াংশ উপহার দেবার পরও তাদের ক্ষিদে মেটেনি। স্বাধীনতার ৭০ বছর পর এটাই আমাদের বাস্তব।

ভারতের অন্য জায়গার থেকে বাংলা ও অসমের তফাত এখানেই যে বাংলা ও অসমের পাকিস্তানগুলি তৈরি হয়েছে মুসলমানদের অনুপ্রবেশের কারণে। এই অনুপ্রবেশের দুটি পর্যায়— একটি আইনি ও অন্যটি বেআইনি। প্রথম সর্বনাশটি ঘটান বাঙালি হিন্দুর অন্যতম প্রধান শত্রু জওহরলাল নেহরু। জনবিনিময় না করতে দিয়ে ১৯৫০ সালে পাকিস্তানের সঙ্গে নেহরু-লিয়াকত চুক্তি করেন। যার ফলে পূর্ব পাকিস্তান চলে যাওয়া মুসলমানদের বেশিরভাগ আবার পশ্চিমবঙ্গে চলে আসে। হিন্দু প্রধান পশ্চিমবঙ্গে তৈরির প্রথম থেকেই নেমে আসে নেহরুর সৌজন্যে পাকিস্তানি আঘাত, ঠিক কাশ্মীরের মতন। নেহরুর এই বিশ্বাসঘাতক চুক্তির বিরোধিতায় শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা থেকে পদত্যাগ করেন।

নেহরুর কাশ্মীরের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা ব্যর্থ করতে গিয়ে প্রাণ দেন শ্যামাপ্রসাদ। দ্বিতীয় স্তরের অনুপ্রবেশ ঘটে ১৯৭২ সাল থেকে বাংলাদেশ হবার পর যখন নেহরু-লিয়াকত চুক্তি আর নেই। মূলত পশ্চিমবঙ্গে কমিউনিস্ট সরকার আসার পর শুরু হয় এই মুসলমান অনুপ্রবেশের প্লাবন। কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকার আর রাজ্যের কংগ্রেস দল এই অনুপ্রবেশকে লুকিয়ে রাখতে সচেষ্ট হয়েছে। তাবৎ বাঙালি সেকুলার অধ্যাপক-গবেষক- বুদ্ধিজীবীরা অনুপ্রবেশ নিয়ে কোনো আলোচনাই হতে দেয়নি। ফলে ১৯৫১ সালের ১৯ শতাংশ মুসলমান আজ ৩০ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। একটি থেকে বাংলার তিনটি জেলা মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়ে গেছে। এই ৩০ শতাংশ ভোটের জোরে এখন পশ্চিমবঙ্গের তৃণমূল সরকারকে শাসন করে ইমাম-পিরদের জামাত। হিন্দুদের জন্য তৈরি পশ্চিমবঙ্গ এখন চলছে মুসলমান মৌলবাদীদের কথায়।

> **“পশ্চিমবঙ্গে কমিউনিস্ট সরকার আসার পর শুরু হয় মুসলমান অনুপ্রবেশের প্লাবন। অনুপ্রবেশ-বিরোধী আন্দোলনকে প্রাধান্য দিয়ে আমাদের আগামীদিনে অগ্রসর হতে হবে, নইলে কেবলমাত্র সরকার বদল করে কিছু হবে না।”**

৭০ বছর পর আবার যদি পশ্চিমবঙ্গকে সত্যি স্বাধীনতার স্বাদ পেতে হয় তবে পশ্চিমবঙ্গের ১ কোটি মুসলমান অনুপ্রবেশকারীকে বিতাড়িত করতে হবে, অন্তত তাদের ভোটাধিকার রদ করে, সমস্ত সরকারি সুবিধা থেকে বাদ দিয়ে তাদের সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় করতে হবে। অনুপ্রবেশ-বিরোধী আন্দোলনকে প্রাধান্য দিয়ে আমাদের আগামীদিনে অগ্রসর হতে হবে, নইলে কেবলমাত্র সরকার বদল করে কিছু হবে না। ■

অতিথি কলম

স্বপন দাশগুপ্ত

অপারেশন বিহার

বিজেপি বিরোধীরা চরম অস্তিত্ব সঙ্কটে

সেটা গত শতাব্দীর রাজনৈতিক উত্থান-পতনে বিক্ষুব্ধ ৯০-এর দশক। যখন বিজেপি নেতৃত্ব নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতেন যে, হঠাৎ করে পালাবদল ঘটিয়ে যাকে বলে রাজনৈতিক 'ক্যু'-এর মাধ্যমে ক্ষমতা দখল, তাদের সেই কিলার 'ইনস্টিংটটাই' নেই। সেকথা এখন আর বলা যাবে না। কয়েক সপ্তাহ আগেই মোদী-অমিত শাহ জুড়ি যে তড়িৎ-তৎপরতার পরিচয় দিয়ে আসল কাজটি করে নিলেন তাতে কী দলের রাজনৈতিক শত্রু, কী মিত্র সকলেই স্তম্ভিত হয়ে গেছেন। ভারতের ইতিহাসে একটি এত বড় সম্পূর্ণ রাজনৈতিক U turn মাত্র ৩৬ ঘণ্টার মধ্যে সফলভাবে সমাপ্ত হওয়ার ঘটনা খুব বেশি নেই। সত্যি বলতে কী দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শুরুতে ইউরোপের ওপর হিটলারের আচমকা যে উপর্যুপরি বিমান আক্রমণ ইতিহাসে Blitzkrieg নামে পরিচিত বা ১৯৬৭ সালে মাত্র ৭ দিনের যুদ্ধে শক্তিধরদের বিরুদ্ধে ইজরায়েলের জয় হাসিল করার মতো ঘটনার কথা মনে পড়ায়। চমক দেওয়ার ক্ষেত্রে নরেন্দ্র মোদীর পারদর্শিতা আজ এক প্রবাদের পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে। গত নভেম্বর মাসের বিমুদ্রীকরণ তার একটি হাতে গরম উদাহরণ। তবুও বিরোধী জোটের ওপর

এই আচমকা আঘাতজনিত যে হতাশা ও বীতশ্রদ্ধভাব লক্ষ্য করা যাচ্ছে তার কতটা ধাক্কা আগামী ২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচনে পড়বে সেটা বুঝতে গেলে জানতে হবে বিরোধী শিবিরে ধ্বংসের পরিমাণ কত? এক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গকে ক্যাটালিস্ট ধরে একটা বিষয় নজর করা যেতে পারে। নীতীশের মহাজোট ভেঙে বেরিয়ে আবার বিজেপি জোটে শামিল হওয়ার ঠিক পাঁচ দিন আগে বিখ্যাত ২১ জুলাইয়ের সভায় মমতা ব্যানার্জী ঘোষণা করেছিলেন দিল্লিতে এখন একটা 'গুণ্ডা' রাজত্ব চালাচ্ছে, তার দল বিজেপিকে তিনি আগামী ১৫ দিন পশ্চিমবঙ্গ থেকে তাড়ানোর কাজে লাগাবেন। বসিরহাটে সাম্প্রতিক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হওয়ার পর মমতা পশ্চিমবঙ্গে এমন একটা রাজনৈতিক পরিস্থিতি তৈরি করতে চাইছেন যাতে বিজেপি এ রাজ্যে টিকতেই না পারে।

অধিকাংশ বাংলা মিডিয়াতে 'সাম্প্রদায়িক দানব' হিসেবে চিহ্নিত হওয়া ছাড়াও এমন একটা প্রচার চালানো হচ্ছিল যেন বিজেপি যা কিছু বাঙালি সংস্কৃতির সঙ্গে জড়িত যেমন মাছ বা রবীন্দ্রনাথ এ সবেরই ঘোর বিরোধী। এছাড়া মমতা হুঙ্কার দিয়েছিলেন মোদীকে পশ্চিমবঙ্গ ছাড়া করার সঙ্গে সারা ভারতে যে মোদী বিরোধী শক্তি যথা লালুপ্রসাদ যাদব, নীতীশকুমার, মুলায়ম সিংহ, সোনিয়া গান্ধী— এমনকী সিপিএম এদের সবাইকেই তিনি একজোট করবেন। এই সূত্রে আসন্ন নির্বাচনে বিরোধীদের তরফে একজন সর্বসম্মত উপরাষ্ট্রপতি পদপার্থী মনোনীত করার দায়িত্বও তিনি নিজের

> মোদী-নীতীশের মিলনের আকস্মিকতায় বিজেপির প্রতি বিরোধীদের বরাবরের বিজাতীয় ঘৃণা পোষণ করার যে নৈতিক অবস্থান তা ধ্বংস হয়ে গেল। এই মুহূর্তে রাজনৈতিক লড়াইয়ের যুক্তিগ্রাহ্যতায় মোদী এগিয়ে গেলেন। বিরোধীদের পড়ে থাকা দু' বছরে নতুন করে বিরোধিতার চিত্রনাট্য রচনা শুরু করতে হবে। হাতে কিছু নেই।

১৫ই আগস্ট বিশেষ সংখ্যা

কাঁধে তুলে নেন। বাস্তবে অন্যান্য আরও অনেক কাজকর্মের মতো রাজনীতিও মূল ধ্বনির প্রতিধ্বনিস্বরূপ একটি কাজ। গোদা বাংলায় যাকে বলে বাবুর তালে তাল দাও। তিনি যা বলবেন সেটাই আওড়াও। এই রাস্তা ধরেই মমতার ভক্তবৃন্দ সতৃষ্ণ নয়নে তাকিয়ে থাকতে শুরু করছিল যে ভারতবর্ষ এক রাজনৈতিক সন্ধিক্ষণের মুখে দাঁড়িয়ে আছে— যে-কোনো সময় দেশে ভয়ঙ্কর ভাবে নিন্দিত মোদী সরকারের, বিশেষত ২০১৯ সালে পতন অবশ্যম্ভাবী এবং পরিণতিতে এক ধর্মনিরপেক্ষ বিরোধী মহাজোট-সরকার ক্ষমতাসীন হবে।

এই প্রজাতির মানুষজন ও অন্য যারা স্রোতের সঙ্গে ভেসে চলতে ভালবাসে তাদের কাছে অকস্মাৎ এই মহাজোট হুড়মুড় করে ভেঙে পড়া অভাবনীয়। তারা আশা করেছিল এই জোটই ২০১৫ সালে বিহারে মোদীকে পরাজয়ের মুখ দেখিয়েছিল। তাই এই রাজনৈতিক কাজের তীব্রতা তাদের কাছে আরও বেড়ে যায় যখন নীতীশ কুমার লালুর সঙ্গে কোনো সমঝোতা না গিয়ে সরাসরি বিজেপির হাত ধরলেন। এর অভিঘাতে বিহারের পরিস্থিতি যে আচমকা বাঁক নেয় তা মমতার মুখনিঃসৃত বাণীর সঙ্গে একেবারেই খাপ খায় না। মমতার কথা অনুযায়ী বিজেপি সরকার যদি জনপ্রিয়তা হারিয়ে ফেলে আর তাদের শেষের সেদিন ঘনিয়ে আসার সঙ্কেত পাওয়া যায় তাহলে নীতীশকুমারের মতো এমন পোড়খাওয়া রাজনীতিবিদ দুম করে বিজেপির সঙ্গে জুড়ে গেলেন কেন? এই প্রসঙ্গে বিহারের মুখ্যমন্ত্রীকে শুধুমাত্র নিছক সুযোগসন্ধানী তকমা দিলে যথার্থ ব্যাখ্যা দেওয়া হবে না। মমতা সর্বদা সুবিধেজনকভাবে যে কথা বলতে ভালবাসেন তা হলো মোদী সরকার সবসময়ই বিরোধীদের নামে মনগড়া, প্রমাণহীন নানান দুর্নীতির অভিযোগ খাড়া করে তাদের নাস্তানাবুদ করতে চায়। সেক্ষেত্রে সেদিন পর্যন্ত মোদী-বিরোধী নীতীশ তাঁর উপমুখ্যমন্ত্রী তেজস্বীর বিরুদ্ধে বিশাল দুর্নীতির অভিযোগ এনে হঠাৎ কেন স্থিতাবস্থা নষ্ট করলেন। যে লোকটি ২০১৩ সালে মোদীর প্রধানমন্ত্রী পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতার খবর পেয়েই তাঁকে ধূর্ত বা 'সাম্প্রদায়িকতার' প্রশ্নে পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য নন এমন একটি অভিযোগ তুলে একটি ১৭ বছরের আঁটসাটো জোট ভেঙে বেরিয়ে গেলেন তার সঙ্গে আদৌ খাপ খাচ্ছে না।

বিহার পরিস্থিতি উদ্ভূত নানান প্রশ্ন এখন বিরোধীদের ছন্নছাড়া করে দিয়েছে। উত্তরপ্রদেশ নির্বাচনে বিজেপির অভূতপূর্ব জয় বা রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে এনডিএ প্রার্থীর অবলীলায় বিরোধীপ্রার্থীকে হারানো এক জিনিস কিন্তু নীতীশকুমারের মোদীর সঙ্গে পুনর্মিলন বিরোধীদের পায়ের তলার জমি কেড়ে নিয়েছে। জোট রাজনীতির ভিতটাই নড়বড়ে হয়ে গেল। আর একটা বড় বিষয় হলো, 'ধর্মনিরপেক্ষতার' বুলিটি আদতে রাজনীতি ক্ষেত্রে প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যবহারযোগ্য। সঙ্গে সঙ্গে এটাও প্রমাণ হলো বিরোধী ঐক্যের ভিত্তিভূমি আদৌ আদর্শগত নয়, না এটা কোনো নির্দিষ্ট কর্মসূচিভিত্তিক। এটা বাস্তবে কেবলই নির্বাচনী পাটীগণিতের হিসেবের ওপর নির্ভরশীল। আরও একটি দিক যা উঠে এল তা ভারতীয় গণতন্ত্রের পক্ষে ভয়ঙ্কর। বিজেপি বিরোধী রাজনীতি আজ শুধুই দাঁড়িয়ে আছে দুর্নীতিবাজদের প্রশ্রয় দেওয়া, আর কী কেন্দ্রে কী রাজ্যে পরিবারতন্ত্রকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার নিন্দনীয় প্রচেষ্টার ওপর। অথচ মজার কথা হলো যে ভারতীয় গণতন্ত্রের এই শ্রেণীই বিজেপি বিরোধিতার নামে নৈতিকতার এক উচ্চ অবস্থান নিয়ে লোককে বিভ্রান্তিতে রেখে চলেছেন।

বিহারে পটপরিবর্তনের ফলে ২০১৯-এ নির্বাচনের ভাগ্য নির্ধারিত হয়ে গেল এমনটা বলা হয়তো আপাতভাবে খুবই সোজা। রাজনীতিতে কিন্তু দু'বছর অনেক দীর্ঘ সময়। তবু মোদী ও নীতীশের মিলনের এই আকস্মিকতায় বিজেপির প্রতি বিরোধীদের বরাবরের বিজাতীয় ঘৃণা পোষণ করার যে নৈতিক অবস্থান তা ধ্বংস হয়ে গেল। এই মুহূর্তে রাজনৈতিক লড়াইয়ের যুক্তিগ্রাহ্যতায় মোদী এগিয়ে গেলেন। বিরোধীদের পড়ে থাকা দু' বছরে নতুন করে বিরোধিতার চিত্রনাট্য রচনা শুরু করতে হবে। হাতে কিছু নেই। ■

FORUM FOR INTELLIGENT PLANNING N OPERATION

আপনাকে সাদর আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে সম্মেলনে উপস্থিত থাকার জন্য

বিষয় : স্বাধীনতার ৭০ বছর পর বাংলা?

তারিখ : ১৪ই আগষ্ট, ২০১৭, সোমবার
সময় : সকাল ৯ ঘটিকা হইতে দুপুর ১টা পর্যন্ত
স্থান : মহাজাতি সদন

—ঃ বক্তা ঃ—

স্বামী পরমাত্মানন্দজী মহারাজ, অধ্যাপিকা শ্রীমতী লিপি ঘোষ
অধ্যাপক শ্রী অম্বুজ মোহান্তি, কাজী মাসুম আখতার - শিক্ষাবিদ ও কলামিস্ট
শ্রী প্রিয়দর্শী দত্ত - সাংবাদিক, শ্রী দিলীপ ঘোষ - সভাপতি বিজেপি, পঃবঃ
শ্রী রন্তিদেব সেনগুপ্ত - সাংবাদিক

১০/১১, বিজয়গড়, কোলকাতা - ৭০০ ০৩২ দূরভাষ : ৯৪৩৩৩৫৫৩৬২

মুর্শিদাবাদে ছাত্রী নিখোঁজ, পুলিশের হিন্দু নিগ্রহ

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ রাজ্যের মহিলাদের নিরাপত্তা নিয়ে ফের প্রশ্ন উঠল। মুর্শিদাবাদ জেলার রঘুনাথগঞ্জ ২নং ব্লকের সেকেনদারা গ্রামের পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্রী ফুলটুসি ঘোষ ২০ জুলাই থেকে নিখোঁজ। ঘটনার দিন সে ঠাকুরমার কাছে ঘুমিয়ে ছিল। ঘুম ভাঙার পর ঠাকুমা দেখেন যে ফুলটুসি নেই। অভিযোগ, পুলিশ এই ঘটনার কোনও ডায়েরি প্রথমে নিতে চায়নি। পরে ঠেকায় পড়ে নেয়। ফুলটুসির সন্ধান এখনও পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। এরপরের ঘটনা ২৭ জুলাই। এদিন পূজা ঘোষ নামের একাদশ শ্রেণীর এক ছাত্রীকে অপহরণ করার সময় সেকেনদারা গ্রামের বাসিন্দারা একজন মহিলাকে হাতেনাতে ধরে ফেলেন। পরে তাকে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। পুলিশের হেফাজতেই ওই মুসলমান মহিলার মৃত্যু হয়। উল্লেখ্য, অঞ্চলটি সংখ্যালঘু অধ্যুষিত। পুলিশ ১০ জন হিন্দু গ্রামবাসীকে এই ঘটনায় জড়িত থাকার সাজানো অভিযোগে গ্রেপ্তার করে। গ্রামবাসীদের অভিযোগ, তল্লাশির নামে পুলিশ বেছে বেছে গ্রামের হিন্দুদের ওপর অত্যাচার চালাচ্ছে। প্রতিদিন গভীর রাতে পুলিশ এসে হিন্দুদের বাড়ি ভাঙচুর করছে। অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করা হচ্ছে মহিলাদের। বেশিরভাগ পুরুষ গ্রামছাড়া। যারা এখনও রয়ে গেছেন তাদের প্রশ্ন, পুলিশি হেফাজতে কারও মৃত্যু হলে তার দায় পুলিশের। তা হলে গ্রামের হিন্দুদের ওপর এই অত্যাচার চালানো হচ্ছে কেন? স্বাভাবিক ভাবেই পুলিশের কাছে এ প্রশ্নের কোনও উত্তর নেই। উত্তেজিত গ্রামবাসীরা গণ-স্বাক্ষর সংগ্রহ অভিযানে নেমেছেন। চলছে বৃহত্তর আন্দোলনের ভাবনাও।

উবাচ

অরুণ জেঠলি
কেন্দ্রীয় অর্থ ও প্রতিরক্ষা মন্ত্রী

“রাজেশের দেহে যে ভাবে আঘাত করা হয়েছে, তাতে জঙ্গিরাও লজ্জা পাবে। কোনও বিজেপি বা এনডিএ শাসিত রাজ্যে এ ধরনের ঘটনা ঘটলে তো পুরস্কার ফেরানোর ধুম লেগে যেত।”

কেরলে আর এস এসের স্বয়ংসেবক রাজেশের খুন হওয়া প্রসঙ্গে

তথাগত রায়
রাজ্যপাল, ত্রিপুরা

“এক কোটি লোক বাস্তুচ্যুত হয়েছেন বাংলাদেশে। ধর্ষিতা হয়েছেন অসংখ্য। ১৯৭১ সালের মে মাসে বসিরহাট থেকে মাত্র ৪০ কিলোমিটার দূরে খুলনার চুপনগরে একদিনে প্রায় ১০ হাজার খুন হয়।”

কলকাতা প্রেস ক্লাবে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে

ইমাম বরকতি
টিপু সুলতান মসজিদের ইমাম

“তৃণমূল সাংসদ ইদ্রিশ আলি চাপ দিয়েছিল তাই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বিরুদ্ধে ফতোয়া জারি করেছিলাম। নয়তো এমন কাজ কখনওই করতাম না।”

প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে ফতোয়া প্রসঙ্গে

ড. হিমন্ত বিশ্ব শর্মা
অসমের অর্থমন্ত্রী

“অনেক বছর ত্রিপুরা শাসন করেছেন মানিক সরকাররা। এবার বেজিং গিয়ে বিশ্রাম নিন।”

ত্রিপুরার ছয় তৃণমূল বিধায়কের বিজেপিতে যোগদান প্রসঙ্গে

কুমর মহসিন শেইখ
পাক বংশোদ্ভূত মহিলা

“২৩ বছর ধরে আমি নরেন্দ্র ভাইয়ের হাতে রাখি বাঁধছি। তখন উনি সঙ্ঘের প্রচারক ছিলেন। এখন দেশের প্রধানমন্ত্রী। কিন্তু আমাদের সম্পর্ক আগেকার মতোই আছে।”

রাখিভাই নরেন্দ্র মোদীর হাতে রাখি পরানো প্রসঙ্গে

কেরলে স্বয়ংসেবককে হত্যার বীভৎসতা সন্ত্রাসবাদীদেরও লজ্জা দেবে : জেটলি

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ সম্প্রতি কেরলে সিপিএমের হাতে নিহত রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের স্থানীয় কার্যকর্তা রাজেশ। রাজেশের পরিবারের সঙ্গে দেখা করে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলি এই ভয়ঙ্কর অপরাধের বর্বরতা জেনে হতভম্ব হয়ে যান। তিনি বলেন, 'রাজেশের শরীরে যে ধরনের আঘাতের চিহ্ন রয়েছে তা নৃশংস সন্ত্রাসবাদীদেরও লজ্জায় ফেলে দিতে পারে।' তিনি সব রাজনৈতিক দলের প্রতি দ্রুত এই হিংসা বন্ধের আবেদন জানান।

রাজেশের পরিবারে সমবেদনা জানাচ্ছেন শ্রীজেটলি।

এ প্রসঙ্গে জেটলির বক্তব্য, একটি রাজ্যের হিংসা দমনে প্রাথমিক ভূমিকা সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকারের। কেরলের সিপিএম সরকার কাল্পনিক ভাবে প্রমাণ করার চেষ্টা করছে যে বিজেপির সমর্থকরা তাদের ওপর একইভাবে হামলা চালাচ্ছে। ক্ষমতাসীন দল যদি মদত দেয় তাহলে তাদের সমর্থকরা এই ধরনের হত্যায় অবলীলায় মেতে উঠতে পারে। সিপিএম সরকারের দায় রাজ্যে শান্তি ফেরানোর। জেটলি নিহত রাজেশের বাড়িতে সমবেদনা জানাতে গেলে তাঁর মা সরাসরি জানতে চান কেন তার ছেলের প্রাণ কেড়ে নেওয়া হলো? অকালে স্বামীহারা রাজেশের স্ত্রী অপরাধীদের গ্রেপ্তারের দাবি জানান। প্রসঙ্গত, রাজেশের পরিবার অত্যন্ত দরিদ্র। নিহত রাজেশের ভাই পরিবারে একমাত্র উপার্জনকারী, তিনি অটো চালিয়ে বর্তমানে ৯ জনের এই পরিবারটি সামলাচ্ছেন।

এই ঘটনার সূত্রে আর এস এস, বিজেপি কর্মীদের এক সভায় জেটলি বলেন, দেশের চরমতম শত্রুরাও এই ধরনের হত্যাকাণ্ড ঘটায় না। সভায় জেটলি ঘোষণা করেন এর পরও কেরলে আমাদের কর্মীদের মনোবল ভাঙা যাবে না। সাংবাদিক সম্মেলনে জেটলি বলেন, 'আমি আমার সহকর্মীদের দুঃখের ভাগ নিতেই এখানে এসেছি। কিন্তু অনেকেই বলছেন সিপিএম কর্মীদের হত্যা করার বদলা হিসেবেই এই খুন।' জেটলি তীব্র ভাষায় এর প্রতিবাদ জানিয়ে বলেন, অপরাধী কখনই অসার যুক্তি দিয়ে পার পেতে পারে না, সর্বভারতীয় পরিসরে এই ক্রমিক হত্যার প্রসঙ্গ তিনি তুলবেন।

উত্তর প্রদেশে অপরাধী দমনে কড়া আইন চান মুখ্যমন্ত্রী যোগী

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ মহারাষ্ট্রে বলবৎ থাকা মহারাষ্ট্র কন্ট্রোল অব অরগানাইজড ক্রাইম অ্যাক্ট (এমসিওসিও) এর ধাঁচে উত্তর প্রদেশে ইউপিসিওসিএ আইন আনতে চলেছেন যোগী। এই আইনের সঙ্গে যুক্ত হতে পারে আরও কিছু কঠিন ধারা। এক উচ্চপদস্থ পুলিশ অফিসারের বক্তব্য অনুযায়ী উত্তর প্রদেশে সংগঠিত অপরাধ দমনে যোগী কঠোর পদক্ষেপ নিতে বদ্ধপরিকর। প্রসঙ্গত, মায়াবতী এক সময়ে এই আইন চালুর কথা ভাবলেও পরে পিছিয়ে আসেন। এই সূত্রে মুখ্যমন্ত্রী বিধানসভার উভয়কক্ষেই খুব তাড়াতাড়ি একটি বিল পাশ করিয়ে তা রাষ্ট্রপতির অনুমোদনের জন্য পাঠাতে চান। বিগত চার মাস ধরে ভয়ঙ্কর দাগি আসামিদের বিরুদ্ধে সরকার কঠোরতম ব্যবস্থা নিয়ে অপরাধের সংখ্যা কমিয়ে আনবার সবরকম চেষ্টা করছে।

প্রসঙ্গত উত্তরপ্রদেশের গোরক্ষপুরের মতো অপরাধপ্রবণ অঞ্চল থেকে দীর্ঘদিন সাংসদ থাকার সুবাদে যোগী জানেন অপরাধ জগতের সঙ্গে দাগি অসাধু রাজনীতিবিদদের যোগসাজস ছাড়া এই ধরনের অপরাধ ঘটানো যায় না। আর এর দমনে প্রয়োজন ইউপিসিওসিএ (উত্তরপ্রদেশ কন্ট্রোল অব অর্গানাইজড ক্রাইম অ্যাক্ট)।

প্রসঙ্গত, মহারাষ্ট্র ও গুজরাট তৎকালীন ইউপিএ সরকারের ধারণায় যেহেতু এই আইন দাগি সংখ্যালঘু মূল অপরাধীদের ওপর প্রয়োগ করেছিল তাই তারা উত্তর প্রদেশের ক্ষেত্রে মায়াবতীকে ২০০৭ সালে রাষ্ট্রপতি দ্বারা চূড়ান্ত অনুমোদন দেয়নি। এরপর মুলায়ম সংখ্যালঘুদের পক্ষ নিয়ে এই আইনের তীব্র বিরোধিতা করায় ও ২০০৯-এর লোকসভা নির্বাচন এগিয়ে আসায় রাজনীতির স্বার্থে মায়াবতী হাল ছেড়ে দেন। দশ বছর পরে সঙ্গে আরও কড়া ধারা জুড়ে সেই আইন এবার সম্ভবত লাগু হতে চলেছে বলে জানিয়েছেন জনৈক আই পি এস অফিসার। এই আইন লাগু হওয়ার ইতিহাস ঘেঁটে আরও একটি চাঞ্চল্যকর তথ্য উঠে এসেছে। ভূতপূর্ব মুখ্যমন্ত্রী কল্যাণ সিংহের আমলের এক পুলিশ তদন্ত রিপোর্টে উঠে আসে রাজ্যের নির্মাণ শিল্প, বন দপ্তর, রিয়েল এস্টেট কয়লা ও অন্য খনিজ উৎপাদন ক্ষেত্রে দশ হাজার কোটি টাকার সম্পদ মাফিয়া ডনরা কবজা করে নিয়েছে। কল্যাণ সিংহ কাজ শুরু করার আগেই তাঁর সরকারের পতন হয়।

স্বস্তিকা

পূজা সংখ্যা : ১৪২৪

মহালয়ার আগেই প্রকাশিত হবে

পরিবারের সবাই মিলে পড়ার মতো শারদীয়া

উপন্যাস

শেখর সেনগুপ্ত - বিপরিণাম
সুমিত্রা ঘোষ - চিরন্তন কাহিনি

উপন্যাসোপম বড় গল্প

প্রবাল চক্রবর্তী - সম্ভবামি

গল্প

এষা দে, শেখর বসু, রমানাথ রায়, সিদ্ধার্থ সিংহ,
সন্দীপ চক্রবর্তী, গোপাল চক্রবর্তী, বিরাজনারায়ণ রায়

প্রবন্ধ

অচিন্ত্য বিশ্বাস, অমলেশ মিশ্র, প্রণব চট্টোপাধ্যায়, স্বরূপপ্রসাদ ঘোষ,
রন্তিদেব সেনগুপ্ত, সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, সৌমেন নিয়োগী,
রবিরঞ্জন সেন, রজত রায়, জিষ্ণু বসু, অর্ণব নাগ, দেবীপ্রসাদ রায়,
পিনাকপাণি ঘোষ, রজত পাল, ড. সীতানাথ গোস্বামী, বিজয় আঢ্য

আপনার কপি আজই বুক করুন।। দাম : ৭০.০০ টাকা

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার করুন।
মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর,
মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

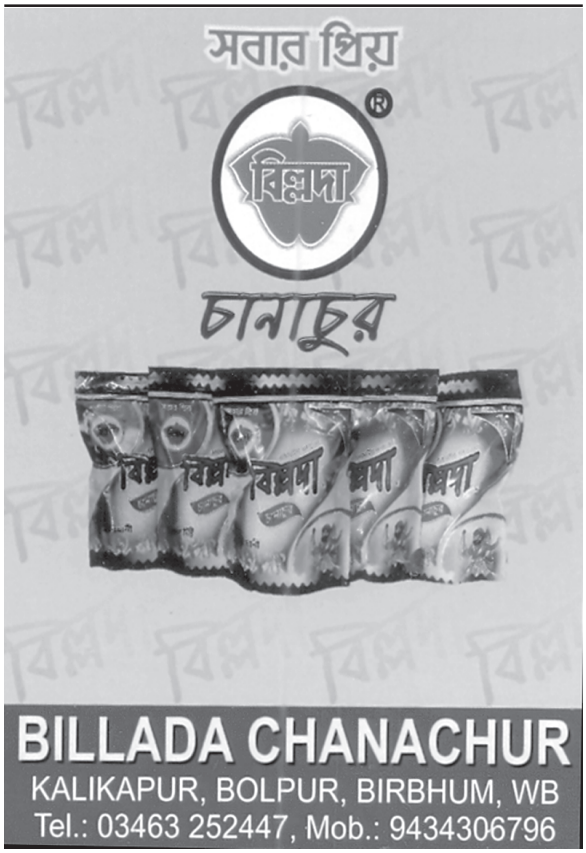

যোগ চিকিৎসা

যে কোনও শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধ তিতে মাত্র ২০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনষ্টিটিউট অব কালচার,
যৌগিক কলেজ অ্যাণ্ড নার্সিং হোম,

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯ ফোন ঃ ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩ যৌগিক নার্সিংহোম (২০টা শয্যা) ঃ ২নং ঘোষপাড়া, নাজিরবাগান, ঢাকুরিয়া, কলকাতা-৭০০ ০৭৮ ফোন ঃ ২৪১৫-৩৫৬৬

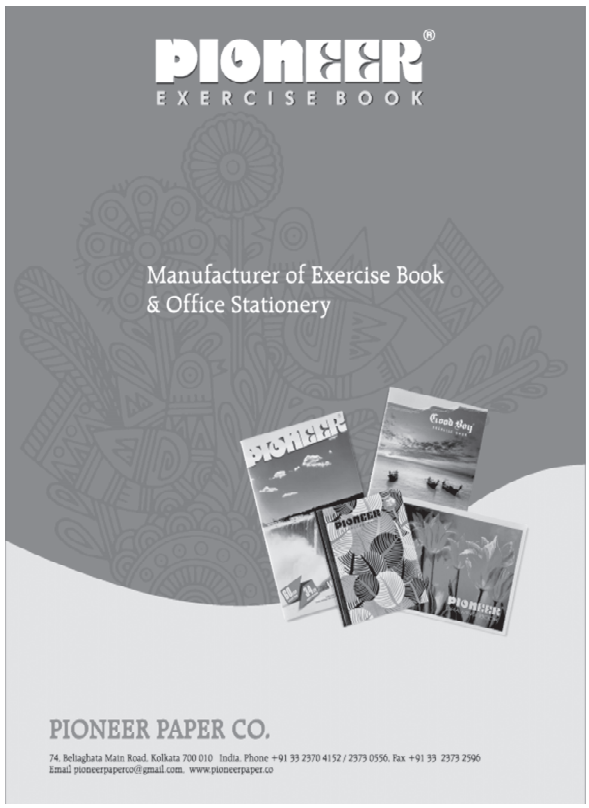

Swastika Weekly, RNI No. 5257/57 Postal Registration No. KOL RMS/048/2016-18
14 August - 2017 - Rs. 10.00, **15 August Issue**

श्री नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री

सरदार सरोवर विस्थापितों के लिये मध्यप्रदेश सरकार की एक और संवेदनशील पहल

श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश

विस्थापित परिवारों के लिये 900 करोड़ रुपये का अतिरिक्त पैकेज

सरदार सरोवर डूब प्रभावित विस्थापित परिवारों के लिये मध्यप्रदेश सरकार ने एक और अतिरिक्त पैकेज स्वीकृत किया है।
इस पैकेज में विस्थापित परिवारों को मिलेंगे ये लाभ :-

- डूब क्षेत्र में रह रहे विस्थापितों को मकान बनाने के लिए अब एकमुश्त रुपये 5 लाख दिए जायेंगे। इसके अलावा रुपये 80 हजार अस्थाई व्यवस्था एवं राशन के लिए भी पहले की तरह मिलेंगे।
- पुनर्वास स्थलों के लिए 25% से अधिक भूमि अधिग्रहित होने वाले मामलों में रुपये 15 लाख का पैकेज।
- 25% से कम भूमि अधिग्रहण के मामलों में भी जितने प्रतिशत भूमि गई है, उसी अनुपात में रुपये 15 लाख का पैकेज।
- महात्मा गाँधी स्मारक राजघाट के पुनर्स्थापन स्थल कुकरा में भव्य स्मारक।
- मंदिरों की कलेक्टर खाते में जमा भू-अर्जन राशि पर ब्याज के लिए रुपये 27 करोड़।
- पुनर्वास स्थलों पर सतत् विकास कार्य। डूब के बाद भी जहां समस्या हो वहाँ सड़क, पुल, पुलिया बनाने का कार्य निरंतर किया जायेगा।
- आवास प्लाट की रजिस्ट्री और मालिकाना हक़ दिया जायेगा। रजिस्ट्री पर स्टाम्प ड्यूटी से छूट।
- डूब में जाने वाली पाइप लाइन का सर्वे कर मुआवजा दिया जायेगा।

05.06.2017 के पैकेज में प्रदत्त लाभ जो पूर्ववत मिलेंगे

- सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में छूटे भूमि के बदले भूमि के पात्र परिवारों को भी रुपये 15 लाख का पैकेज।
- डूब क्षेत्र में निवासरत परिवारों को जिनके पास प्लाट नहीं हैं 180 अथवा 150 वर्गमीटर का प्लाट।
- जिन परिवारों ने प्लाट के बदले रुपये 50 हजार लिए थे, उन्हें भी 180 अथवा 150 वर्गमीटर का प्लाट।
- अस्थाई आवास एवं राशन के लिए रुपये 80 हजार।
- कुम्हारों के लिए स्थान नियत कर उन्हें ईंट बनाने के लिए जगह और फ्लाई ऐशब्रिक व्यवसाय हेतु प्रशिक्षण।
- विस्थापित मछुआरों की सहकारी समिति बनाकर उन्हें मत्स्याखेट के अधिकार।
- विस्थापित नाविकों को नवीन सृजित घाटों पर प्राथमिकता। आकस्मिक कार्य योजना के दौरान उन्हें रोज़गार।

विस्थापित परिवारों की सजग और संवेदनशील संरक्षक
मध्यप्रदेश सरकार

मध्यप्रदेश जनसम्पर्क द्वारा जारी
आकल्पन : मध्यप्रदेश माध्यम/2017

Published and Printed by Ranendra Lal Banerjee on behalf of Swastik Prakashan Trust at 27/1B Bidhan Sarani, Kolkata-6.
Printed at Seva Mudran, 43, Kailash Bose St. Kolkata-6. Editor : Bijoy Adhya. ।। দাম ১০ টাকা ।।